ভারত-ভাস্কর্যে কামসূত্র

সূচীপত্র

প্রথম প্রসঙ্গ

সাধারণ কথা

প্রথম অধ্যায় : বিষয় বিন্যাস
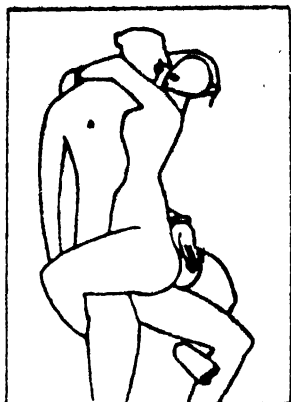
ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটিকে বলা হয় ত্রিবর্গ। এই ত্রিবর্গই মানুষের প্রয়োজন। এদের মধ্যে আবার ধর্ম ও অর্থ কামনা পূরণের উপায় মাত্র। তাই, ত্রিবর্গের মধ্যে কামই প্রধান।

যদিও ধর্ম ও অর্থ কামনা পূরণের উপায়—আরও অন্য উপায়ের সাহায্য না নিলে কামনা পূরণ হতে পারে না। আর সেই সব উপায়ের কথা জানতে হলে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন এই 'কামসূত্র' পাঠ—ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে তা জানা যায় না। কি উপায়ে বিনা বাধায় কামভোগ সম্ভব—তা নির্ণয় করাই কামশাস্ত্রের লক্ষ্য। সুতরাং কামশাস্ত্র উপেক্ষা করার কোনো যুক্তি নেই। অবশ্য শাস্ত্র পাঠ না করে গুরুর কাছ থেকেও উপদেশ নেওয়া চলতে পারে; কিন্তু সেই গুরুকেও তো শাস্ত্র পাঠ করেই জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, নইলে তিনি শিষ্যকে উপদেশ দেবেন কি করে?

সুতরাং কামশাস্ত্র চাই—এই শাস্ত্র উপেক্ষার বস্তু নয়। যে শাস্ত্র পাঠ করে নি সে কদাচিৎ হয় তো কামসাধন করতে পারে কিন্তু তা তো প্রশংসার কথা নয়। ঘুণে যখন কাঠ কাটে, কোথাও হয় তো হঠাৎ অক্ষরের মতো হয়ে যায়—তাই বলে কি ঘুণকে গুরুমশাই বলে তার কাছে অক্ষর লেখা শিখতে হবে?

এর বিপরীতও দেখা যায়—কেউ হয় তো কামশাস্ত্র পাঠ করেও নারী-ব্যবহারে অপটু থেকে যায়। এই ক্ষেত্রে শাস্ত্রের দোষ নয়—দোষ ব্যবহার-কর্তার। সেই দোষ থেকে মুক্তি পেতে হলে চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিও কি সকলেই সুপথ্য গ্রহণ করে থাকেন ?

ঈপ্সিত শাস্ত্র যাতে নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয় সেই জন্য ইষ্টদেবতাকে নমস্কার করে কাজ শুরু করতে হয়—

সুতরাং ধর্ম অর্থ ও কামের উদ্দেশ্যে নমস্কার !

এই শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে যে চলবে ত্রিবর্গে অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কামে তার সিদ্ধিলাভ হবে। যে সকল আচার্য ধর্ম, অর্থ ও কামের অনুষ্ঠান নিজেরা করেছেন, পরকে করিয়েছেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রেখে গেছেন আমাদের জন্য, তাদের উদ্দেশ্যেও অভিবাদন জানাই।

ধর্ম দ্বারা পরলোকে শুভ গতি হয়, সধর্মে অশুভ গতি হয়ে থাকে ; অর্থ দ্বারা ইহলোকেই দিব্যসুখ লাভ সম্ভব। অর্থহীনতায় কষ্টে জীবনধারণ এবং অধর্মের সূচনা হয়। কামের দ্বারা সুখলাভ ও সন্তানজন্ম—দুই-ই আয়ত্ত হয়ে থাকে।

নন্দীকে নমস্কার !

মহাদেবের অনুচর এই নন্দী ! মহাদেব যখন দীর্ঘকাল উমার সহিত সুরতক্রীড়ায় আসক্ত হয়ে সুখানুভব করছিলেন তখন নন্দীই দ্বারদেশে থেকে স্বরচিত কামসূত্রের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ঋষি উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতুকে নমস্কার ! তিনি সাধারণের কল্যাণের জন্যই নন্দী প্রচারিত সুবৃহৎ কামশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশ করেছিলেন। আরও সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশ করেছিলেন বাভ্রব্য !

পঞ্চালদেশীয় এই মনীষীকেও নমস্কার।

আমার রচিত কামশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হচ্ছে। মোট সাতটি প্রসঙ্গের আলোচনায় গ্রন্থটি সমাপ্ত। প্রত্যেকটি প্রসঙ্গেই কয়েকটি আলোচ্য বিষয় রয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে এই বিষয়গুলি বিভক্ত হয়েছে।

প্রথম প্রসঙ্গ : সাধারণ কথা

সাধারণ কথাগুলি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত—

প্রথম অধ্যায় : **বিষয় বিন্যাস**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **ত্রিবর্গ লাভ**

ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের জ্ঞানলাভ

তৃতীয় অধ্যায় : **বিদ্যা গ্রহণ**

ত্রিবর্গ প্রাপ্তির প্রথম উপায় বিদ্যা গ্রহণ; যে যে বিদ্যা গ্রহণ করতে হবে—এই অধ্যায়ে থাকবে তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

চতুর্থ অধ্যায় : **বিদগ্ধজনের পরিবেশ**

বিদগ্ধজন-সুলভ আচারের অনুশীলন

পঞ্চম অধ্যায় : **নায়ক ও নায়িকা : দূত ও দূতীকর্ম**

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ : কন্যা সমাগম

প্রাসঙ্গিক আলোচনাগুলি এখানে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়েছে—

প্রথম অধ্যায় : **সম্বন্ধ বিচার : কন্যাবরণ**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **প্রয়োগ বিধি**

এই অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য—কন্যার বিশ্বাস-উৎপাদন রীতি।

তৃতীয় অধ্যায় : **প্রথম আরম্ভ : ইঙ্গিতাকারতত্ত্ব**

বরণের যোগ্য কন্যা যদি না মেলে তবে গান্ধর্বাদি বিধানের কথা

ভাবতে হবে। সেই ক্ষেত্রে কন্যাকে অনুরক্ত করার উপায় কি?

চতুর্থ অধ্যায়ঃ **উদ্যোগ**

যে কন্যা ইঙ্গিতাকারের সাহায্যে মনের ভাব প্রকটিত করেছে তার সম্পর্কে উদ্যোগী হতে হবে কিন্তু সে উদ্যোগ হবে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ **গান্ধর্ব বিবাহ**

তৃতীয় প্রসঙ্গঃ **ভার্যা**

ভার্যা প্রসঙ্গে দুটি অধ্যায়—

প্রথম অধ্যায়ঃ **একচারিণী ঃ প্রোষিতভর্তৃকা**

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ **জ্যেষ্ঠা সপত্নী, কনিষ্ঠা সপত্নী, অন্যপূর্বা, সপত্নীপীড়িতা, আন্তঃপুরিকা, বহুপত্নীক পতির প্রতিপত্তি।**

চতুর্থ প্রসঙ্গঃ **বারবণিতা**

বারনারী প্রসঙ্গে ছটি অধ্যায়—

প্রথম অধ্যায়ঃ **সহায়-গম্য-অগম্যচিন্তা**

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ **কান্তানুরঞ্জন**

তৃতীয় অধ্যায়ঃ **অর্থার্জনের উপায়; বিরক্ত লক্ষণ; বিরক্তবিজয়; ব্যবহারবিধি।**

চতুর্থ অধ্যায়ঃ **ত্যাগ ও সন্ধি**

যার ধন শোষিত হয়েছে তাকে বর্জন করে পূর্ব পরিচিত নূতন ধনবান ব্যক্তির সঙ্গে সন্ধি।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ **লাভালাভ বিবেচনা**

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ **অর্থ-অনর্থ-পরিণাম-সংশয় বিচারঃ গণিকা ভেদ**

পঞ্চম প্রসঙ্গঃ **পরনারী**

প্রথম অধ্যায়ঃ **শীলবিচার; নিবৃত্তিকারণ; সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ; অযত্নসাধ্যা নারী।**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **পরিচয় বিধি ও উত্তম**

তৃতীয় অধ্যায় : **ভাবপরীক্ষা**

চতুর্থ অধ্যায় : **দূতীকর্ম**

পঞ্চম অধ্যায় : **ধনেশ্বরের কামনা**

ষষ্ঠ অধ্যায় : **অন্তঃপুরিকা**

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ : **সমাগম**

প্রথম অধ্যায় : **বিষম সঙ্গম**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **আলিঙ্গন**

তৃতীয় অধ্যায় : **চুম্বন**

চতুর্থ অধ্যায় : **নখক্ষত**

পঞ্চম অধ্যায় : **দন্তক্ষত ; দেশভেদে বিধিভেদ**

ষষ্ঠ অধ্যায় : **সঙ্গম বিধি**

সপ্তম অধ্যায় : **সুরতকলহ : সীৎকার**

অষ্টম অধ্যায় : **পুরুষ সক্রিয় : সক্রিয়া নারী**

নবম অধ্যায় : **রতির সূচনায় : রতির অবসানে**

সপ্তম প্রসঙ্গ : **যোগবিধান**

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ পর্যন্ত কামসূত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সব বিধানে যদি অভিপ্রায় সিদ্ধ না হয় তবে অথর্ববেদোক্ত এবং তন্ত্র-শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত কয়েকটি বিধানের সাহায্য নিতে হবে। সপ্তম প্রসঙ্গে অথর্ববেদের এবং তন্ত্রশাস্ত্রের কয়েকটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আলোচিত হয়েছে। সপ্তম প্রসঙ্গে আছে দুটি অধ্যায়—

প্রথম অধ্যায় : সৌভাগ্যবৃদ্ধি ; বশীকরণ ; বৃষীভবন

দ্বিতীয় অধ্যায় : নষ্টরাগের পুনরুদ্ধার, সাধনাঙ্গের বৃদ্ধি।

এই শাস্ত্র দু' ভাগে বিভক্ত—তন্ত্র ও আবাপ। যার সাহায্যে রতিকে তন্ত্রিত অর্থাৎ উদ্বোধিত করা যায় তাকে তন্ত্র বলে, যেমন চুম্বন ও আলিঙ্গন প্রভৃতি। সেই চুম্বন ও আলিঙ্গন গ্রন্থের যে অংশে

উপদিষ্ট হয়েছে তাকেও 'তন্ত্র' শব্দে অভিহিত করা যায় (ষষ্ঠ প্রসঙ্গ); যার দ্বারা পূর্ণ রতির জন্য স্ত্রী ও পুরুষকে পাওয়া যায় তাকে বলে আবাপ; 'আবাপ' অর্থ সঙ্গমের উপায়। সেই উপায় গ্রন্থের যে অংশে ব্যাখ্যাত হয়েছে তাকেও 'আবাপ' বলা চলে। (দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম প্রসঙ্গ)।

এদিকে আবার সাধারণ কয়েকটি অনুষ্ঠান না হলে তন্ত্র ও আবাপের প্রশ্ন ওঠে না—এমনি কয়েকটি প্রাথমিক বিষয়ের আলোচনা আছে প্রথম প্রসঙ্গের 'সাধারণ কথা'য়, যেমন নায়ক ও নায়িকা, দূত ও দূতীকর্ম। প্রথম প্রসঙ্গের সাধারণ কথা এবং সপ্তম প্রসঙ্গের 'যোগবিধান' প্রকৃতপক্ষে তন্ত্র ও আবাপেরই অন্তর্গত।

কামশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়সূচী সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদর্শিত হয়েছে। কামশাস্ত্রে কামই প্রধানত অন্য বিষয়গুলি তার অঙ্গীভূত।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে থাকবে অঙ্গীভূত বিষয়গুলির বিস্তৃত আলোচনা। প্রথমে সমগ্র শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলি একস্থানে সংক্ষিপ্ত আকারে দেখা থাকলে, পরে সেই বিষয়গুলির বিস্তৃত বিবরণ পড়তে আর কষ্ট হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রিবর্গ লাভ

এক
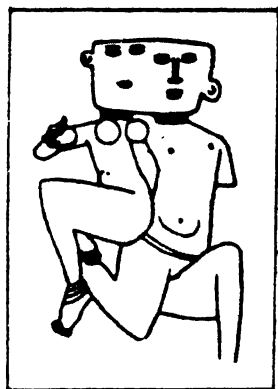
'ত্রিবর্গ লাভ' কথাটির অর্থ ত্রিবর্গ সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের অনুষ্ঠানে সফলতা লাভ করতে হলে ধর্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র বা কামশাস্ত্র পড়তে হবে।

নারীর ত্রিবর্গসেবা পুরুষের অধীন, তাদের ত্রিবর্গসেবায় কোনো স্বাধীনতা বা প্রাধান্য নেই। শ্রুতি বলেন, পুরুষ শতায়ু; ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত বাল্যকাল—বালক যতদিন দুগ্ধান্নপোষ্য থাকে; সত্তর বৎসর পর্যন্ত মধ্যমকাল (যৌবন) তারপর তার বৃদ্ধত্ব। বাল্যে বিদ্যা ও অর্থের সেবা, যৌবনে কামের সেবা আর বার্ধক্যে ধর্মের সেবা—এই হল শাস্ত্রের নির্দেশ।

যার যে কাল বলা হয়েছে, সেই কালে প্রত্যহ তার সেবা করতে হবে।

কিন্তু আয়ুর তো কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই; দেখা যায়, শতবর্ষের মধ্যেই মানুষের মৃত্যু ঘটে—তখন যখন যেমন উচিত মনে হবে তেমনি ভাবেই ধর্মার্থকামের সেবা করবে—বাল্যে অর্থ ও ধর্মের, যৌবনে কাম ধর্ম ও অর্থের, বার্ধক্যে ধর্ম এবং সামর্থ্য থাকলে, অর্থ ও কামের। তাহলে বিদ্যাগ্রহণ কবে হবে?

বাৎস্যায়ন বিধান দিয়েছেন—বিদ্যাগ্রহণ পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যের সেবা

করতেই হবে—'যাবৎ বিদ্যা ন গৃহ্যতে তাবৎ কামং ন সেবেত'—যতদিন বিদ্যাগ্রহণ সমাপ্ত না হয় ততদিন কামের সেবা বর্জন করবে। এর অন্যথা করলে অধর্ম হবে, বিদ্যাগ্রহণেও ব্যাঘাত ঘটবে।

কেউ কেউ আবার পুরুষের একশত বৎসর আয়ুকে তেত্রিশ বৎসর চার মাস হিসেবে ভাগ করেন। এদের মতে তেত্রিশ বৎসর চার মাস পর্যন্ত বাল্যকাল—ছেষট্টি বৎসর আট মাস পর্যন্ত যৌবন তারপর বার্ধক্য। এই বিভাগ ব্যবস্থায় 'তেত্রিশ বৎসর চার মাস' ব্যাপী বাল্যকাল; সুতরাং এই সুদীর্ঘ বাল্যকালেও ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা চলবে—তবে ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত বিদ্যাগ্রহণ এবং ব্রহ্মচর্যের সেবা। অন্য সেবা ষোড়শ বর্ষের পরে। তখন কামভাবের জাগরণ ঘটে।

সুতরাং এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হল যে তেত্রিশ বৎসর চার মাস ব্যাপী বাল্যকালে ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা পর্যায়ক্রমে চলতে পারবে।

কিন্তু এই ধর্ম, অর্থ ও কামের স্বরূপ কি? অর্থাৎ ত্রিবর্গ বলতে আমরা কি বুঝব? কোন উপায়েই বা এই ত্রিবর্গ লাভ সম্ভব?

ধর্ম—প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম বা নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম, দুই-ই হতে পারে। যজ্ঞ, তপস্যা, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম, কেননা শাস্ত্রবিধি দ্বারা মানুষকে এ ব্যাপারে প্রবর্তিত করতে হয়—এ সব অনুষ্ঠানের প্রয়োজন বা ফল—সবই অপ্রত্যক্ষ; এই সব অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তির জন্য বিধি চাই।

এ সব বিধি পালন প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম।

আবার কতকগুলি অনুষ্ঠান থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার জন্যও শাস্ত্রবিধির প্রয়োজন হয়। এ সব অনুষ্ঠানের প্রয়োজন বা ফল—দুইই প্রত্যক্ষ। যেমন: নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ, পরধন অপহরণ, পরনারী-

গমন, মদ্যপান প্রভৃতি। এই সব অপকর্ম থেকে শাস্ত্রবিধির প্রভাবে নিজেকে নিবৃত্ত করা—এই হল নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম।

এই প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক ধর্মের তত্ত্ব জানা যাবে বেদ থেকে, স্মৃতি থেকে; শাস্ত্রে যার অধিকার আছে সে-ই জানতে পারে। যার অধিকার নেই ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে।

অর্থ—বিদ্যা, ভূমি, স্বর্ণ, পশু, ধান্য, গৃহের বিভিন্ন উপকরণ ও মিত্রাদির অর্জন এবং অর্জিতের বর্ধন।

বিদ্যা বলতে এখানে তর্কবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র, বেদান্ত প্রভৃতি; পশু—হস্তী, অশ্ব, গাভী প্রভৃতি; গৃহোপকরণ—লৌহময়, কাষ্ঠময়, মৃন্ময়, বংশ ও চর্মনির্মিত বিভিন্ন উপকরণ; মিত্রাদি—'আদি' শব্দ থাকায় বস্ত্র ও আভরণ বুঝতে হবে।

কাম—আত্মসংযুক্ত মনের দ্বারা অধিষ্ঠিত কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণের নিজের নিজের বিষয়ে অনুকূল ভাবে প্রবৃত্তির নাম কাম।

কাম দুই প্রকার : সামান্য ও বিশেষ। এখানে আছে সামান্য কামের ব্যাখ্যা। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন প্রভৃতি গুণের সমবায় আত্মা; যখন এর প্রযত্ন গুণ উৎপন্ন হয় তখন আত্মা মনের সঙ্গে যুক্ত হন। মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজের নিজের বিষয়ে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধে অধিষ্ঠিত হয়। আত্মাই সেই উপায়ে বিষয় ভোগ করে যে সুখ অনুভব করেন—সেই প্রধান সুখই কাম। সে কামের হেতু—স্বেচ্ছায় প্রবৃত্তি; সে-ও কাম। সুতরাং হেতু ও ফলভেদে **সামান্য কাম** দুই প্রকার। প্রতিকূল ভাবে যে প্রবৃত্তি হয় তা দুঃখের হেতু—তাকে বলা যায় **দ্বেষ**।

বিশেষ কামও দুই প্রকার—প্রধান ও অপ্রধান। অভিমাণিক সুখ অর্থাৎ চুম্বন ও আলিঙ্গনাদির সুখের সঙ্গে জড়িত না থাকলে কাম প্রধান হতে পারবে না। চুম্বন, নখ ও দন্তের ক্ষত যথাস্থানে প্রযুক্ত হলে স্ত্রী-পুরুষের অনুরাগ সঙ্কল্প বশে সুখ হয়—এই রূপ অভিমান

জন্মে ; পরে সঙ্গম ফলবান হওয়ায় আনন্দের বোধও থাকবে—তবে তাকে বলা হবে 'প্রধান'। তা না হলে বিপরীত যোনিতে (পশু প্রভৃতির) অযোনিতে (হস্তমৈথুনাদিতে) এবং অনভিপ্রেত যোনিতে (অর্থাৎ বলাৎকার কালে) যে বোধ জন্মে তাকে কি প্রধান বলা যাবে ?

কাম একটি বিশেষ জ্ঞান—সাধারণ ভাবে তা জানা যায় না। এ ক্ষেত্রেও জিজ্ঞাসা চাই—কামসূত্রের যথাযোগ্য বিচার চাই।

ধর্ম, অর্থ ও কাম : গুরুত্ব বিচার

পূর্ববর্তীকে গুরুতর বলে মনে করতে হবে। ধর্ম, অর্থ ও কাম একসঙ্গে উপস্থিত হলে—সিদ্ধান্ত করতে হবে—যে যার পূর্ববর্তী সে তার চেয়ে গুরু। কামের চেয়ে অর্থ গুরু, অর্থের চেয়ে ধর্ম গুরু।

কাম অর্থসাধ্য ; সুতরাং অর্থসাধ্য কাম অর্থের চেয়ে গুরু হতে পারে না। ইহলোকেও অর্থ ধর্মসাধ্য—পরলোকের স্বর্গ, সুধা, অপ্সরা প্রভৃতি অর্থ তো ধর্মসাধ্য না হয়েই পারে না। সুতরাং ধর্ম-সাধ্য অর্থ, ধর্মের চেয়ে গুরু নয়, অবশ্য সকলের পক্ষেই এই বিধি প্রযোজ্য হবে না।

রাজার পক্ষে অর্থের গুরুত্ব সর্বাধিক, কেননা লোকযাত্রা অর্থ-মূলক। আর গণিকার পক্ষেও অর্থের চেয়ে অধিক গুরুত্ব অন্য কিছুরই হতে পারে না।

দুই

বিরোধ নিষ্পত্তি

বিরোধীরা বলবেন, ধর্ম ও অর্থসাধনের উপায় জানবার জন্য ধর্ম-শাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু কামশাস্ত্রের কি প্রয়োজন ?

তির্যগ যোনিতেও অর্থাৎ গবাদি পশুর মধ্যেও তো শাস্ত্রের উপদেশ ছাড়াই কামের প্রবৃত্তি দেখা যায়। কাম আত্মার একটি নিত্যসিদ্ধ ধর্ম। তমোগুণ সম্পন্ন পশুরাও যদি শাস্ত্রপাঠ না করেই কামসাধনে লিপ্ত হতে পারে তবে রজোগুণ প্রধান মানুষেরাও কি তা পারবে না? বিরোধীদের বক্তব্য: কাম স্বয়ংসিদ্ধ—উপদেশ ছাড়াই কামশিক্ষা সম্ভব; সম্ভব যদি না হবে তবে দেখা যেত নিজের কান্তাকে রমণের উপায় শিক্ষাদানের জন্য হয় তো মৃগ ও পক্ষিগণের মধ্যে গুরু নির্বাচিত হচ্ছে। সুতরাং কামশাস্ত্রের কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন আছে বই কি! কথাটা বুঝিয়ে বলছি—

কাম সম্ভোগের দু'টি উপাদান—আয়তন এবং অঙ্গ। আয়তন অর্থ—নারীদেহ; অঙ্গ—ভূষণ, আলেপন, গন্ধ, মালা, উপবন, শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ কক্ষ, বীণা, মদিরা প্রভৃতি। নারীদেহ যদি উদ্দাম রূপযৌবন সম্পন্ন হয় আর সেই নারী যদি বিভ্রমসম্পন্না হয় তবে সঙ্গম হবে ইচ্ছামূলক অর্থাৎ ইচ্ছা হলেই হবে নতুবা হবে না। বিভ্রম কথাটিকে বুঝে নেওয়া দরকার। বিভ্রম নারীদের শৃঙ্গার ভাবসূচক ক্রিয়া বিশেষ। হয়তো কাছেই বসে ছিল, হঠাৎ উঠে চলে গেল, এই হেসে উঠল, পরক্ষণেই কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করতে লাগল। কিংবা হয় তো নায়কের কাছে কিছু প্রার্থনা করে দু'হাত পাতল— 'তোমার ঐ মালাটা আমায় দাও না!' এও হতে পারে যে বিভ্রমবতী নারীর বস্ত্র যেন অসতর্ক ভাবে হঠাৎ স্খলিত হয়ে পড়েছে!

এ সব ক্ষেত্রে, আগেই বলেছি, ইচ্ছে থাকলেই রমণ সম্ভব। একে বলে আভ্যন্তর রতি। আভ্যন্তর রতির জন্য নির্জন প্রদেশ প্রয়োজন। এ ছাড়া আছে বাহ্য রতি; এই রতিতে বুদ্ধি প্রয়োগ করে অনেক বিষয় বিচার করে দেখতে হয়—অনেক নিয়ম মেনে চলতে হয়, মাল্য গন্ধ, মদিরা প্রভৃতি অঙ্গের প্রয়োগ করতে হয়।

এই সব নিয়ম শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

সঙ্গমে পুরুষ বা স্ত্রী কারও অনিচ্ছা হলে কিংবা পরাধীনা রমনীর লজ্জা বা ভয় হেতু সমাগম সম্ভব না হলে শাস্ত্রোক্ত উপায় অবলম্বন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শাস্ত্রে চৌষট্টি কামকলা ব্যাখ্যাত হয়েছে সেই সব জানতে হবে। তাছাড়া এ সব ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে পরস্পরের চরিতজ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন—সেক্ষেত্রেও শাস্ত্রই একমাত্র আশ্রয়। কামসূত্রের জ্ঞান না থাকলে তার বাস্তব প্রয়োগ কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

সুতরাং কামশাস্ত্র জীবনে অপরিহার্য।

বিরোধীরা বলবেন—তাহলে গবাদি পশুতে কামের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় কিরূপে?

এর উত্তর সামান্য ভাবেই দেওয়া চলতে পারে—তির্যগ জাতি ও মানুষ সমান নয়। ওদের মধ্যে স্ত্রীজাতির কোনো আবরণ নেই। তারা স্বতন্ত্রা ও স্বাধীনা—ঋতুকালেও তাদের প্রবৃত্তি হয়; এই প্রবৃত্তিও অজ্ঞানমূলক। তাদের পক্ষে বিধিজ্ঞানের কোনো প্রয়োজন হয় না।

আবরণের বাধা থাকলেই উপায় অন্বেষণ করতে হয়। তাদের সমাগম উপায়শূন্য। তাছাড়া তির্যগগণ যতক্ষণ নিজেদের তৃপ্তি না হয় ততক্ষণ সঙ্গমরত থাকে, অপরের তৃপ্তি হল কিনা ভেবে দেখে না। মানুষের মধ্যে স্ত্রী-রক্ষার উপায় একমাত্র সমান তৃপ্তিজনিত 'প্রেম'—অবশ্য, মানুষে তা নেই। নেই বলেই তারা অন্য সময়েও সঙ্গম কামনা করে থাকে।

মানুষের সঙ্গে তির্যগ জাতির অনেক পার্থক্য। তির্যগ জাতির ন্যায় যে-কোনো ব্যক্তির পত্নী যদি পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হত তাহলে তার কোন্ পুরুষার্থ সিদ্ধ হত—ধর্ম, অর্থ না কাম?

সুতরাং যাতে সে-পথে যেতে না হয়, যাতে কামবিদ্যায় চতুরতা জন্মে সেইজন্যই কামসূত্রের অবতারণা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, সমান তৃপ্তিজনিত প্রেমই স্ত্রী-রক্ষার একমাত্র উপায়।

তির্যক যোনিতে দৈবাৎ কামের কৃপা আছে তাই তাদের জন্য পৃথক শাস্ত্র রচনার প্রয়োজন নেই; কিন্তু যারা অনুকূল পুরুষ, যাদের স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচুর—ইচ্ছানুযায়ী যার তার সঙ্গে সেই স্ত্রীলোকেরা বিহার করতে পারে তাদের জন্যও কামসূত্রের প্রয়োজন নেই; কিন্তু যাদের স্ত্রী-স্বাধীনতা নেই, যারা পশুর মতো যার তার সঙ্গে বিহার করতে পারে না—তাদের পক্ষে সঙ্গমের পূর্বে সঙ্গমের উপায় জানা প্রয়োজন—সেই উপায়গুলি তাদের শাস্ত্র পড়েই জানতে হবে।

বিরোধীরা বলবেন—ধর্মাচরণের কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা তার ফল ইহজন্মে পাওয়া যায় না; যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করলেও ফল হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ভবিষ্যৎ ফল সংশয়সঙ্কুল—হতেও পারে, না-ও হতে পারে। যত্ন, তপস্যা, কষ্টস্বীকার এবং অর্থক্ষয় করেও যজ্ঞ না হয় অনুষ্ঠিত হল—কিন্তু তা থেকে স্বর্গাদিলাভ যে নিশ্চয়ই হবে তার কোনো স্থিরতা নেই। তবে আর ধর্মাচরণে কি ফল? তাছাড়া যজ্ঞাদির ফল তো ইহলৌকিক নয়—পারলৌকিক! পণ্ডিতেরা বলে থাকেন—হস্তগত দ্রব্যকে পরগত করে লাভ নেই; কাল ময়ূর পাব, এই আশায় থাকার চেয়ে আজকের পারাবত অনেক ভালো।

কিন্তু এ দৃষ্টান্ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বাস্তব জীবনেও আমরা ভবিষ্যৎ ফলের আশায় বর্তমান সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে থাকি। বর্তমানে তিল যব ধান থাকলে বেশ সুখেই দিন যাপন করা যায়; কিন্তু ছয় মাস পরে প্রচুর তিল যব ধানের আশায় সেগুলি ভূমিতে

বপন করা হয় কেন? ফলের অনিশ্চয়তা তো সেখানেও আছে।

তাছাড়া, প্রত্যক্ষ সিদ্ধ কারণ সমান হলেই কি ফললাভ সমান হয়? তা হয় না। যদি হত, তবে পৃথিবীতে এত লোকবৈচিত্র্য থাকত না। আমরা দেখতে পাই যে উপায় প্রয়োগ করে একে লক্ষপতি, অন্যে কোটিপতি, সেই উপায় প্রয়োগ করেই আর একজন 'অন্নভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ' হত না। সুতরাং প্রত্যক্ষসিদ্ধ কারণের ফলাফলও অনিশ্চিত; যদি তাই হয় তবে লোকব্যবহারে সেই সব উপায়ের প্রয়োগ চলে কেন? যদি চলে তবে যজ্ঞাদির ক্ষেত্রেই বা তা নিষিদ্ধ হবে কেন?

অর্থ সম্পর্কেও বিরোধীদের বক্তব্য আছে; তারা বলেন, অর্থের সাধনা করার কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও কদাচিৎ অর্থলাভ হয় আর কখনও কখনও চেষ্টা না করলেও হয়। আসল কথা, কালই সব কিছু করে দেয়। কালই প্রযোজক, পুরুষ কালাধীন; কালই পুরুষের অর্থ ও অনর্থের, জয় ও পরাজয়ের এবং সুখ ও দুঃখের ব্যবস্থা করে থাকে।

এ বিষয়ে বাৎস্যায়নের সিদ্ধান্ত এই—কালানুসারেই হোক বা যে কোনো উপায়ের সাহায্যেই হোক, অর্থের সাধনা করতে হলে পুরুষকার চাই। কিন্তু পুরুষকারও কোনো উপায়ের সাহায্য ছাড়া অর্থ সাধন করতে পারে না। কোনো বিষয় অবশ্যম্ভাবী হলেও উপায়ের সাহায্যেই তা লাভ করতে হয়। নিষ্কর্মা বা উদাসীন ব্যক্তির কোনো মঙ্গল হয় না। 'নিষ্কর্মা' অর্থ যে কোনো উপায়েরই সাহায্য নেয় না।

এই উপায়ের বিবরণ জানতে হলে শাস্ত্রপাঠ অনিবার্য।

বিরুদ্ধবাদীরা কামসেবারও বিরোধী। তারা বলেন—কামাসক্ত হলে মানুষ ধর্মাচরণ করে না, বরং বিপরীত আচরণই করে থাকে। অর্থার্জনেও মন দেয় না—তাছাড়া, বিভিন্ন অশোভন ব্যবসায়ে মত্ত হয়ে থাকে। কামাসক্তির ফলে দেহে রোগ জন্মে, চরিত্র লঘু হয়—এ ছাড়া নিন্দা তো আছেই।

এরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন—কামের বশীভূত হয়ে অনেকে সবংশে বিনষ্ট হয়েছেন, এমন নজীর আছে।

উদাহরণ দিয়ে এরা বলেন, ভোজবংশে জাত এক রাজা—দাণ্ডক্য তার নাম—তিনি কামাধীন হয়ে এক ব্রাহ্মণকন্যায় আসক্ত হয়েছিলেন—তার ফল, বন্ধু ও রাজ্যের সঙ্গে নিজের বিনাশ! রাজা। তিনি মৃগয়ায় গিয়ে আশ্রমে শুক্রাচার্যের কন্যাকে দেখে কামাসক্ত হয়ে তাকে তার রথে তুলে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। শুক্রাচার্য তখন আশ্রমে ছিলেন না। ফিরে এসে কন্যাকে না দেখে ধ্যানস্থ হয়ে সব কথা জানতে পারলেন। এর পর ক্রুদ্ধ ঋষির অভিসম্পাত! রাজ্যে অবিরাম ধূলিবর্ষণ শুরু হল—তাতেই হল বন্ধু পরিজন সহ তার মৃত্যু!

উদাহরণ আরও আছে। কামার্ত ইন্দ্র গৌতমের ভার্যা অহল্যাকে অঙ্কশায়িনী করেছিলেন—ফলে, তাকে অভিশপ্ত হতে হয়েছিল। কামার্ত কীচকের মনেও জেগেছিল দ্রৌপদীলাভের অভিলাষ। ফলে ভীমের হাতে কীচকের মৃত্যু।

বাৎস্যায়ন বলেন—দোষের প্রসঙ্গ আছে বলে কি কামসেবা বর্জনীয় হবে? কাম আহারের তুল্য দেহপোষণকারী—দেহে অজীর্ণাদি রোগ থাকলেও প্রতিদিনই দেহরক্ষার জন্যই খাদ্য গ্রহণ করতে হয়, তবে একটু বুঝে আহার করতে হবে এই পর্যন্ত। কামসুখের জন্যই তো ধর্ম ও অর্থের সেবা! যদি সুখভোগই না হল তবে তো ধর্ম ও অর্থ হয়ে থাকবে বন্ধ্যা!

কামসেবায় দোষের প্রসঙ্গ আসবে সে কথা ঠিক—তবে একটু

বুঝে চলতে হবে। কামবর্জনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অজীর্ণাদি রোগ আছে বলে কি আহার করব না? ভিক্ষুকেরা আছে বলে কি হাঁড়ী চড়াব না? মৃগেরা আছে বলে কি যব বপন করব না? বাৎস্যায়নের মতে অর্থ, কাম ও ধর্মের সেবা করে মানুষ ইহকালে ও পরকালে বাধাহীন সুখভোগ করতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যাগ্রহণ

এক

আগের অধ্যায়ে ত্রিবর্গের কথা বলা হয়েছে, এই ত্রিবর্গলাভের প্রথম উপায় হল বিদ্যাগ্রহণ। যে বিদ্যাগ্রহণ করতে পারে নি, পরবর্তী বিষয়গুলিতে তার পক্ষে অধিকারী হওয়া কঠিন।

বিদ্যাগ্রহণ সম্পর্কে বাৎস্যায়নের মত এই যে পুরুষ ধর্মবিদ্যা, ও অর্থবিদ্যা তো যথাকালে গ্রহণ করবেই এবং এ দুটির যে সব অঙ্গবিদ্যা আছে তা-ও গ্রহণ করবে। তবে এই সব বিদ্যার গ্রহণে যাতে বাধা সৃষ্টি না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মাঝে মাঝে কামসূত্র এবং তার অঙ্গবিদ্যা নিজেরা পাঠ করবে এবং অন্যের মুখে শুনবে। নারী যৌবনের পূর্বে পিতৃগৃহে থেকে কামশাস্ত্র এবং তার অঙ্গবিদ্যাগুলি আয়ত্ত করবে, বিবাহিতা হলে স্বামীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বিদ্যাগ্রহণ চলবে। স্ত্রীলোকের শাস্ত্র গ্রহণে অধিকার নেই—বা যোগ্যতা নেই, এই জাতীয় শাসন বা বিধান নিরর্থক।

তাছাড়া স্ত্রীলোকের তো পুরুষের 'প্রয়োগ' গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং প্রয়োগের জ্ঞান তাদের থাকা প্রয়োজন—জানার জন্য প্রয়োগে অভিজ্ঞ পুরুষের নিকট তারা যেতে পারে না। এই জন্যই শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের উপযোগী নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। স্ত্রীলোকের উপযোগী যে সব নির্দেশ শাস্ত্রে থাকবে, স্ত্রীলোকেরা

অন্য পুরুষের কাছে কি ভাবে তা জানতে পারবে? শুধু যে কামশাস্ত্রেই প্রয়োগ গ্রহণের কথাটা উঠবে তা নয়, অন্য শাস্ত্র সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য। যেমন ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ সম্পর্কে এই প্রশ্ন উঠতে পারে।

সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে নারী নির্জন প্রদেশে বিশ্বাসের যোগ্য ব্যক্তির নিকটে শাস্ত্র এবং তার প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

নির্জন প্রদেশে কেন?. লজ্জা নিবৃত্তির জন্য। বিশ্বাসের যোগ্য ব্যক্তি কারা?

যে স্ত্রী পূর্বে পুরুষ সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়েছে এবং যার সঙ্গে সে একত্র বর্ধিত হয়েছে সেই ধাত্রীকন্যা প্রথম। যে স্ত্রী পূর্বে পুরুষ সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়েছে এবং যার সঙ্গে অকপটে কথা বলা যায় এইরূপ সখী—দ্বিতীয়া। পূর্বে পুরুষ সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়েছে এমন সমান বয়স্কা মাসী—তৃতীয়া বা মাসী স্থানীয়া বৃদ্ধা দাসী—চতুর্থী; পূর্বে যার সঙ্গে প্রীতি জন্মেছে এমন ভিক্ষুকী—পঞ্চমী; বিশ্বাসের পাত্রী যদি হয় তবে জ্যেষ্ঠা ভগিনী—ষষ্ঠী। ভিক্ষুকীও আচার্যা হতে পারে, কেননা ভিক্ষা উপলক্ষ্যে তাকে বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়—তাই নানা বিষয়ে সে অভিজ্ঞ। জ্যেষ্ঠা ভগিনী আচার্যা হতে পারবে যখন সে বিশ্বাসের পাত্রী—যখন তার সমক্ষেই বিশ্বাসবশতঃ অন্য পুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়া যাবে; তা না হলে, ভগিনী ভগিনীকেও ঈর্ষাবশতঃ শিক্ষা দান করে না।

এখানে পুরুষের কথা বলা হল না, কেননা পুরুষ স্বাধীন; তার পক্ষে উপদেষ্টা দুর্লভ নয়।

দুই

কামশাস্ত্রের অন্তর্গত চৌষট্টি প্রকার অঙ্গবিদ্যার কয়েকটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল—

গীত বাদ্য নৃত্য

আলেখ্য—রূপের বিশেষত্ব। যাকে বলে 'রূপ কলানো'; যার যেখানে যেরূপ হওয়া উচিত সেইরূপ রূপ করা।

বিশেষক চ্ছেদ্য—বিশেষক অর্থ তিলক—ললাটে যা দেওয়া হয়। এটি বিলাসিনীদের অত্যন্ত প্রিয়।

পুষ্পাস্তরণ—বাসগৃহে বা উপাসনাগৃহে নানা বর্ণের পুষ্প দ্বারা যে শয্যা রচনা করা হয়। এরই একটি প্রকারের নাম পুষ্পশয়ন বা 'ফুল শয্যা'।

দশনবসনাঙ্গ রাগ—দশন (দাঁত) বসন (বস্ত্র) এবং অঙ্গ (দেহ) কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্বারা রঞ্জিত করা; এটিও বিলাসিনীদের প্রিয়।

শয়ন রচনা—শয়নকারীর মনের ভাব বুঝে শয্যা প্রস্তুত করা।

মাল্যগ্রহণ বিকল্প—মালা গাঁথায় নৈপুণ্য।

নেপথ্য প্রয়োগ—দেশ ও কাল অনুসারে বস্ত্র মাল্য ও অলঙ্কারে দেহসজ্জা।

ভূষণযোজন—অলঙ্কার যোজনা; অলঙ্কার বিরচন অর্থাৎ অলঙ্কার প্রস্তুতকরণ—দেহে অলঙ্কার যোজনা নয়।

পুস্তক বাচন—শৃঙ্গার প্রভৃতি রসের উদ্বোধনের জন্য সঙ্গীত রচনা ও গান—অন্যের অনুরাগ জন্মাবার জন্য এবং নিজের চিত্ত বিনোদনের জন্য এটি প্রয়োজন।

শুকসারিকা প্রলাপন—শুক ও সারিকাকে (টিয়া, চন্দনা, ময়না ও শালিক প্রভৃতি পাখিকে) মানুষের ভাষায় পড়াতে পারলে সুন্দর পড়ে এবং অনেক সময়ে সংবাদ-দূতের কাজ করতে পারে।

অক্ষর সৃষ্টিকা কথন—অর্থাৎ সাঙ্কেতিক লেখার জ্ঞান। গোপন বিষয় সাধারণের সামনে অভীষ্ট লোকের কাছে ব্যক্ত করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। একে অক্ষরমুদ্রাও বলা হয়।

দেশভাষা বিজ্ঞান—কোন বিষয় হয় তো সাধারণের নিকট

অপ্রকাশ্য—কিন্তু তাদের সামনেই যদি সেটি অন্য ব্যক্তিকে জানাতে হয় তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষাজ্ঞান প্রয়োজন।

ধারণমাতৃকা—শ্রুত গ্রন্থের ধারণার্থ শাস্ত্র-বিশেষ। এই শাস্ত্র জানলে শ্রুত গ্রন্থের বিস্মরণ হবে না। এর সাহায্যে শ্রুতিধর হওয়া যায়।

বৈয়ামিকী বিদ্যা—এর প্রয়োজন ইচ্ছানুযায়ী দেহকে কার্যক্ষম করা। ব্যায়ামকে অবলম্বন করে এটি করা হয় বলে নাম 'বৈয়ামিকী'। মৃগয়া প্রভৃতি এরই একটি অঙ্গ। দেহের উৎকর্ষ সাধন এবং জীবনের নিরাপত্তা বিধানেই এর প্রয়োজন।

এইগুলি কামশাস্ত্রের প্রধান অঙ্গবিদ্যা—বর্তমান অধ্যায়ের বিদ্যাগ্রহণ বলতে এইগুলিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিদগ্ধজনের পরিবেশ

এক
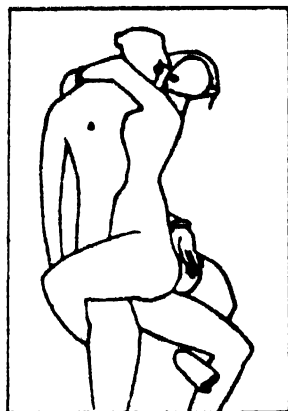
বিদ্যাগ্রহণের পর সকল বর্ণের (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র) মানুষকেই সংসারাশ্রমে প্রবেশ করতে হয়। তখন অর্থের উপার্জনে মনোযোগী হতে হবে। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ধন থাকলেও নূতন ভাবে নূতন অর্থের সন্ধান করতে হবে।

নগরে, রাজধানীতে অথবা সজ্জনের আশ্রয় যেখানে সেই স্থানে বাস করাই ভালো। কিংবা যেখানে থাকলে দেহরক্ষা সম্ভব সেখানেই থাকবে। সে স্থান গ্রাম হলেও আপত্তি করা সঙ্গত নয়—জীবিকার জন্য মানুষকে তো ভিন্ন বৃত্তিও গ্রহণ করতে হয়।

কোথায় গৃহ নির্মাণ করবে? যেখানে কাছে জল আছে। যেদিকে জল থাকবে সেখানে থাকবে পুষ্পোদ্যান। গৃহের কর্মানুসারে এক একটি কক্ষের বিভাগ থাকবে—সব কর্ম একটি কক্ষে করলে গৃহের শোভা নষ্ট হয়। অন্ততঃ বসবার জন্য এবং শয়নের জন্য দুটি কক্ষের ব্যবস্থা থাকবে। বাইরের কক্ষেও একটি শয্যার ব্যবস্থা থাকবে—সেই শয্যায় থাকবে সুন্দর দুটি বালিশ এবং অতি শুভ্র চাদর। মাথার দিকে থাকবে তৈলচিত্রযুক্ত একটি ব্র্যাকেট—নীচে থাকবে একটি টেবিল। সেখানে থাকবে রাত্রির উপভোগযোগ্য অনুলেপন মালা, গন্ধের কৌটা বা শিশি রাখবার পেঁটরা আর

পান। মাটিতে থাকবে পিকদানী, বীণা, চিত্রফলক, চিত্রকর্মে
উপযোগী তুলি ও রঙ, যে কোনো বই ও মালা।

শয্যার নিকটেই ভূমিতে থাকবে একটি চেয়ার, পাশা ও দাব খেলার ছক্, বাইরে খেলার পাখির খাঁচা, একটি নির্জন প্রদেশে নৃত্য-গীতের স্থান। পুষ্পোদ্যানের মধ্যেই একটি দোলা (দোল খাবার জন্য) তৈরি করতে হবে। এই উদ্যানে পুষ্পিত লতামণ্ডপের নীচে পরিস্কৃত ভূমির উপর একটি বেদিকা তৈরি করাতে হবে।

ভিতরের কক্ষ থাকবে অন্তঃপুরচারিণী পরিবারবর্গের শয়নের জন্য। বাইরের ঘরে রমণের জন্য শয্যা থাকতে পারে—খাটের উপরে একটি চাদর—মাথার নীচে ও পায়ের দিকে রঙীন ছিটের বালিশ। চাদরের মধ্যভাগ নরম, রোজ অথবা দু'তিন দিন পর পর ধোবাবাড়িতে পাঠাবার মতো উপযুক্ত একটি আস্তরণ অবশ্য উপরে বিছিয়ে দিতে হবে। চন্দনাদি অনুলেপন প্রাতে উপভোগের জন্য—রাত্রিশেষে মালা। বীণা শোভার জন্য, সকল সময়ে বাজাবার জন্য নয়।

নায়ক প্রভাতে শয্যাত্যাগ করে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করবেন। সূর্যোদয়ের পরেও শয্যায় শায়িত থাকা দোষের বিষয়।

নিত্যস্নান দেহের পক্ষে কল্যাণকর—এতে দেহ শুচি হয়, সৌন্দর্যও বাড়ে; দ্বিতীয় তৈলাদির সাহায্যে দেহ পরিষ্কার করতে হবে; তৃতীয় দিনে সাবান ব্যবহার অবশ্য কর্তব্য; তা না করলে জঙ্ঘার উপরের অংশ কর্কশ হয়ে যেতে পারে। এক পক্ষের মধ্যে অন্ততঃ তিনবার দাড়ি গোঁফ কামানো দরকার। পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে—দিন ও রাত্রিকে আট ভাগ করে পূর্বাহ্নে তিনভাগে কাজকর্ম করবে, চতুর্থ ভাগে স্নান করে ভোজন করবে। দিবাশয্যা অধর্ম হলেও গ্রীষ্মকালে দেহের যথেষ্ট ক্ষয় হয়ে থাকে তাই তার পোষণার্থে দিবাশয়ন অনুমোদিত হতে পারে। গ্রীষ্মকালীন দিবানিদ্রাকে ধর্ম হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত।

সন্ধ্যাকালে নৃত্য গীত ও বাদ্য; তারপর ঘর পরিচ্ছন্ন করে পুষ্পরাশি বিছিয়ে শয্যারচনা; শয্যারচনার পরে বাইরের বাসকক্ষে সুরভি ধূপ জ্বলবে। শেষে শুরু হবে সংকেতকারিণী অভিসারিকার প্রতীক্ষা। সাঙ্কেতিক সময় পার হয়ে যাবার পরও সে যদি না আসে তবে তার কাছে দূতী পাঠাবে। দূতী পাঠালেও সে যদি মান করে না আসে—তবে নিজেই যাবে।

অভিসারিকা এলে তার মন জয় করার জন্য মধুর কণ্ঠে সুমিষ্ট আলাপ করবে। কি রকম?

—'বেশ স্বচ্ছন্দে আসতে পেরেছ তো? পথে কোনো অসুবিধে হয় নি? বোসো এইখানে। তুমি যে আসতে পেরেছ—এই আমার ভাগ্যি। আচ্ছা, তুমি তো জানোই যে আমার প্রাণ তোমার কাছে বাঁধা—তবে কেন এত দেরী করলে?'—এই রকম মিষ্ট কথায় তাকে প্রসন্ন করবে। উঠে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবে।

দুই

যাত্রার ব্যবস্থা, গোষ্ঠীতে মিলনের ব্যবস্থা, সকলে মিলে পান ব্যবস্থা, উদ্যান-সম্মেলন, সমস্যাক্রীড়া প্রভৃতিরও ব্যবস্থা রাখতে হবে।

গোষ্ঠী সমবায় কি?

গণিকার গৃহে বা অন্য কোনো নাগরিকের গৃহে গণিকাদের সঙ্গে সমান বিদ্যা, সমান বুদ্ধি, সমস্বভাব, সমধন ও সমবয়স্কগণের একত্র অবস্থানের নাম গোষ্ঠী। সেখানে এদের কাজ কাব্যচর্চা। অসমান বিদ্যাদি থাকায় পরস্পর মিলন হতে পারে না।

সকলে মিলে একসঙ্গে যে পান ব্যবস্থা তাকে বলে 'আপানক'। পরস্পরের গৃহে অর্থাৎ এক সময়ে একের গৃহে; অন্য সময়ে অন্যের গৃহে—এইভাবে পক্ষ বা মাসের কোনো একটি বিশেষ দিনেই তা করা সঙ্গত। বাৎস্যায়ন বলেছেন—সে দিনটি 'প্রজ্ঞাত' হওয়া

দরকার—যেদিন যে দেবতার প্রসিদ্ধ সেইদিন 'প্রজ্ঞাত'; যেমন গণেশের চতুর্থী, সরস্বতীর পঞ্চমী।

যারা উদ্যান বিহার করবেন তাদেরও এই ভাবে 'আপানক'-বিধি পালন করতে হবে। নিজের রচিত সরোবরে, যেখানে সোপান শ্রেণী নির্মিত হয়েছে, যেখানে হিংস্র প্রাণীর কোনো অস্তিত্ব নেই সেখানে গ্রীষ্মে জলক্রীড়ার ব্যবস্থা থাকবে। কারণ অন্য সময়ে বার বার স্নান, সাঁতার, জলবাদ্য প্রভৃতি ক্রীড়া সম্ভব নয়।

উদ্যান যাত্রার কথা বলা হল; এখন সমস্যাক্রীড়া ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

সমস্যা ক্রীড়া কি?

যক্ষরাত্রি, কোজাগর ও সু-বসন্তক।

যক্ষরাত্রি : অর্থ সুখরাত্রি। কার্তিকী পূর্ণিমার রাত্রিকেই যক্ষরাত্রি বলা হয় কেননা যক্ষগণ সে সময়ে সন্নিহিত থাকে। সেই রাত্রিতে লোকেরা সাধারণতঃ দ্যূতক্রীড়া করে থাকে।

কৌমুদীজাগর : (কোজাগর) আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় কৌমুদী জ্যোৎস্নার আধিক্য হয় তাই তাকে বলা হয় 'কৌমুদী'। সে সময়ে দোলা, দ্যূতক্রীড়া—এই সব হয়ে থাকে।

সু-বসন্তক : মদনোৎসব। বসন্তে মদন চতুর্দশী তিথিতে এই উৎসব হয়—এই সময়ে নৃত্যগীতবাদ্যসহ ক্রীড়া হয়ে থাকে।

কাব্যসমস্যা, কলাসমস্যা এ সব থাকবেই সুতরাং গোষ্ঠীতে আলোচনাও থাকবে। এ বিষয়ে একটি কথা মনে রাখা দরকার—কেবল সংস্কৃতে বা কেবল দেশভাষার সাহায্য নিয়ে গোষ্ঠীতে কথা না বললে লোকে বহুমত হবে। যে গোষ্ঠীর উপর লোকের বিদ্বেষ আছে বা যেখানে কেবল পরহিংসা বা পরচর্চা হয়ে থাকে পণ্ডিতেরা সেই জাতীয় গোষ্ঠীর অবতারণা করেন না। লোকের চিন্তানুযায়ী এবং চিত্তরঞ্জনের অনুরূপ ক্রীড়ামাত্রই যে গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য—সেই জাতীয় গোষ্ঠীর সহচর হলে বিদ্বান ব্যক্তি সার্থক হন।

পঞ্চম অধ্যায়

নায়ক ও নায়িকা দূতকর্ম

এক
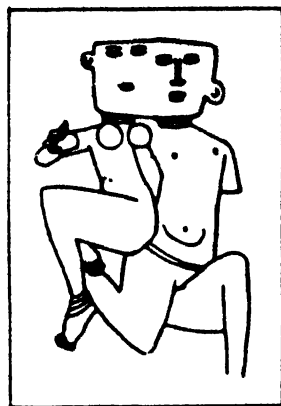
দূত প্রেরণের কথা পূর্বে বলা হয়েছে—এই অধ্যায়ে থাকবে দূত ও দূতীর কর্ম সম্পর্কে আলোচনা।

কাম দুই প্রকারের—প্রথম পুত্রার্থ, দ্বিতীয়—সুখার্থ। তার মধ্যে অনন্যপূর্বা (যে অন্যপূর্বা নয় অর্থাৎ যার সঙ্গে অন্য পুরুষের সঙ্গম হয় নি) সবর্ণাতেই উভয় প্রকার প্রবৃত্তি চরিতার্থ হতে পারে। উত্তমবর্ণা পরের বিবাহিতা, অসমানবর্ণা গণিকা বা বিধবাতে সে প্রবৃত্তি সার্থকতা অসম্ভব।

এদের মধ্যে গণিকা এবং অন্যের সঙ্গে বিবাহিত হয়ে ক্ষত বা অক্ষতযোনি অবস্থায় বিধবা হয়েছে এবং ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় সঙ্গমে স্বীকৃত হয়েছে এই শ্রেণীর মিলন শাস্ত্রে বিহিত নয় আবার নিষিদ্ধও নয়। অন্য পুরুষ যাকে ভার্যারূপে পূর্বে গ্রহণ করেছিল সে ক্ষত বা অক্ষতযোনি হয়ে বিধবা হলে যদি ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতাবশতঃ অন্যের হয় তবে তাকে বলে 'পুনর্ভূ'।

নায়িকা তিনটি—কন্যা, পুনর্ভূ এবং গণিকা। সবর্ণা অনন্যপূর্বা কন্যাই শ্রেষ্ঠ; দ্বিতীয় অধমবর্ণা; তৃতীয় পুনর্ভূ। সে স্বীকৃত হলেও আগে অন্যের নিকট স্বীকৃত হয়েছে। পুনর্ভূ সম্পর্কে পরে জানা যাবে। আর যে অন্যের স্বীকৃত হয়ে অক্ষতযোনি অবস্থায়

বিধবা হয়েছে সে কতকাংশে নায়িকাপদ পাবার যোগ্য।

পরস্ত্রীও নায়িকাপদের যোগ্য হবে যদি পুত্র এবং সুখলাভ ছাড়া অন্য কারণে পরস্ত্রীর সঙ্গে রমণ করা হয়।

অন্য কারণ কি?

পরস্ত্রী গমন দুইটি কারণে সমর্থনযোগ্য। প্রথমতঃ এ নারীর স্বামী মহৎ এবং ঐশ্বর্যশালী—আমার শত্রুর সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার ক্ষতি করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ তার সাহায্যে আমার শত্রু আমার অপকার করতে পারে। আমি যদি এই নায়িকার সঙ্গে মিলিত হই তবে এর প্রভাবে ঐ অপকার বা ক্ষতির পথ বন্ধ করা যাবে অথবা এও হতে পারে এই ভ্রষ্টা নারী যদি প্রভুত্বশালিনী হয় তবে আমার সংসর্গে, আমার প্রেমে সে তার পতিকে আমার অনুকূল করে দিতে পারে।

অথবা পরস্ত্রী সঙ্গমের অন্য কারণও থাকতে পারে। —'এ রমণী বিত্তশালিনী—আমার জীবিকার উপায় নেই। এর সঙ্গে সঙ্গত হলে আমি ক্রমশঃ সেই ধনের অধিকারী হতে পারি।' পরস্ত্রী সঙ্গমের এ-ও একটি কারণ হতে পারে। কুটুম্ব ভরণে অসমর্থ ব্যক্তি এইভাবে কুকর্ম করে ধন সঞ্চয় করতে পারে। এতে কোনো দোষ হয় না।

এই ভাবে ভবিষ্যৎ অপকার রোধ করার জন্য ও বর্তমান জীবিকার পথ সহজ করার জন্য পরস্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করা যেতে পারে—এতে কোনো অধর্ম নেই।

কিংবা রাজাদেশে প্রচ্ছন্ন কোনো শত্রুর সন্ধান জানবার জন্যও পরস্ত্রীগমন চলতে পারে। আমার কোনো উপায় নেই, শত্রুর ঠিকানা জানতে পারি—এর সঙ্গে মিলিত হলে সে আনন্দের আধিক্যে সব গোপনীয় কথা বলে দিতে পারে।

পরস্ত্রীগমনের অন্য কারণ থাকাও সম্ভব। হয় তো আমি যাকে মনে মনে কামনা করি এমন অর্থবতী এবং রূপবতী কন্যা এর অধীন। এর সঙ্গে মিলতে পারলে তার সঙ্গে মিলিত হওয়া সম্ভব।

এই সব কারণে পরস্ত্রী সঙ্গম কর্তব্য।

তবে এই জাতীয় সাহসিক কর্ম কেবল অনুরাগবশতঃ করা অনুচিত।

এই চার প্রকার নায়িকা ছাড়া কামশাস্ত্রে আরও চার প্রকার নায়িকার উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু তারা এই চতুর্বিধ নায়িকা-শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।

দুই

এখন নায়কের কথা।

নায়ক তিন শ্রেণীর—উত্তম মধ্যম ও অধম। তবে নায়ক একই। কেবল গুণাগুণ ভেদে এই বিভাগ।

সহায় নিরূপণ কিভাবে করতে হবে?—স্নেহের দ্বারা, গুণের দ্বারা, জাতির দ্বারা। মিত্রই হল স্নেহের দ্বারা নিরূপিত সহায়। এই মিত্র নয় প্রকার—(১) খেলাধূলার সাথী, (২) অর্থের বিনিময়ে এবং (৩) জীবনরক্ষার মাধ্যমে সম্পাদিত মিত্রতা, (৪) সমান শীল ও সমান আসক্তিযুক্ত ব্যক্তি (৫) সহপাঠী, (৬) মর্মজ্ঞ, (৭) রহস্য যে জানে (৮) ধাত্রীর সন্তান এবং (৯) একত্র একসঙ্গে সংবর্ধিত ব্যক্তি।

গুণের দ্বারাও সহায় নিরূপণ হতে পারে। যেখানে মিত্রতা পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে, যার বাক্যে ও কর্মে বিরোধ নেই, যার কর্ম কোন সময়ে বিকৃত হয় না, যে বশীভূত, কখনও যে পরিত্যাগ করে না, যে কোনো কিছুতেই লুব্ধ হয় না, যাকে অন্যে বাধ্য করতে পারে না, যে কখনও গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ করে না—এরাই প্রকৃষ্ট সহায়। এই সব গুণ থাকলে সকলেই মিত্র হতে পারে।

জাতির বিচারে কারা সহায় হতে পারে? রজক, নাপিত, মালাকার, গন্ধদ্রব্য বিক্রেতা, শুঁড়ি, ভিক্ষুক, গোপালক, বারুই, সোনার বেনে, কুপিতা স্ত্রীকে প্রসন্ন করবার শক্তি যার আছে,

কামকলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি, বিদূষক প্রভৃতি। এরাই নায়কের শ্রেষ্ঠ সহায়। এদেরই দূতের কর্ম করতে হবে।

যে নায়ক ও নায়িকা উভয়ের নিকট নিজের কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছে, বিশেষতঃ যে নায়িকার নিকটে অত্যন্ত বিশ্বস্ত, দূতকর্মের ভার তাকেই দিতে হবে।

এই সব সহায়ের মধ্যে যার দৌত্যকর্ম করার উপযুক্ত গুণ আছে তাকেই এই কাজে নিযুক্ত করতে হবে। দূতের কি কি গুণ থাকা দরকার ?

বাকপটুতা (বুদ্ধিপূর্বক কথাবার্তা বলার শক্তি), প্রগল্‌ভতা (অপরাধী হলেও শঙ্কিত না হওয়া, তিরস্কৃত হলেও লজ্জা বোধ না করা, কোনো বিষয়ে সঙ্কোচ না করা), ইঙ্গিত ও আকার দেখে সেই ভাবে কাজ করার যোগ্যতা, প্রতারণা করার উপযুক্ত অবসর বুঝে নেবার শক্তি, সন্দেহ স্থলে সিদ্ধান্ত করার মতো উপস্থিত বুদ্ধি, এবং কর্তব্য স্থির করে উপযুক্ত উপায়ের সাহায্যে অতি সত্বর তা সম্পাদন করার যোগ্যতা। এই সব হল দূতের গুণ।

এই সব সহায় যাদের আছে তারাই নারীসাধনার যোগ্য। উপযুক্ত সহায় নিয়ে অগ্রসর না হলে ভাগ্যবিপর্যয়—এমন কি জীবনের হানিও হতে পারে।

প্রথমে আত্মপরীক্ষা প্রয়োজন—তারপর সহায় পরীক্ষা—নায়িকা পরীক্ষা। নায়িকা পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুতর। এক্ষেত্রে অনুমানই একমাত্র সম্বল। নায়িকার হাবভাব, চালচলন প্রভৃতি দেখে তার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করতে চেষ্টা করবে—তারপর দেশ-কাল বিবেচনা করে নিঃসন্দেহ চিত্তে সাধনায় প্রবৃত্ত হবে।

মনে রাখতে হবে—এ ব্যাপারে পদস্খলন অমার্জনীয় অপরাধ।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

কন্যা সমাগম

প্রথম অধ্যায়

সম্বন্ধ বিচার ঃ কন্যাবরণ

সমাগম না হলে সঙ্গম হয় না। তাই প্রথমে সমাগমের উপায়-গুলি আলোচিত হচ্ছে। যে উপায় অবলম্বন করলে স্ত্রীসমাগম লাভ করা যায় তাকে শাস্ত্রে বলে 'আবাপ'।

সমাগম লাভের উপায় আটটি বিবাহ—ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য, আর্ষ, গান্ধর্ব, আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষস। এদের মধ্যে প্রথম চারটি ধর্মীয়, পরের চারটি তার বিরোধী অর্থাৎ অধর্মীয়। 'কন্যাবরণ' অধ্যায়ে প্রথম চারিটির আলোচনা প্রথমে করা হচ্ছে।

বরণ দুই প্রকার—পৌরুষে ও দৈব বিধানে সম্পাদিত। প্রথমে পৌরুষ অর্থাৎ প্রথম প্রকার বরণের কথা—

এস্থলে মাতা, পিতা এবং অন্যান্য সম্বন্ধিগণের প্রযত্ন প্রয়োজন। যাদের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়—সেইরূপ দুই পক্ষের সম্বন্ধযুক্ত মিত্রেরাও চেষ্টা করতে পারেন। এরা কন্যাপক্ষের মিত্রজনকে শোনাবেন বরের গুণকীর্তন—তাতে থাকবে নায়কের কুলশীল সৌন্দর্য ও অন্যান্য গৌরবের কথা। কন্যার পিতামাতাকে শোনাবেন নায়কের সেই সব গুণের কথা যা শুনলে তাদের কন্যাদানের আগ্রহ বাড়ে। দৈবজ্ঞরূপেও তাদের অনেক কথা বলতে হবে—এতে থাকবে নায়কের কোষ্ঠীবিচার ও ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত।

এ সব ব্যাপারে যথাস্থিত বস্তুর বর্ণনায় অনেক সময়ে কোনো

ফল হয়। এইজন্য একটু কৌশলের প্রয়োজন হতে পারে। কন্যার মাতাকে হয়তো বরপক্ষীয় মিত্রগণ বলবেন—'অমুক সেনাপতির কন্যা যেমন রূপবতী তেমনি ধনবতী; ঐ সেনাপতি তার কন্যাকে এই বরের হাতেই সমর্পণ করতে ইচ্ছুক। আমরাও তার প্রস্তাবের কথা ভাবছি—দেখা যাক কি হয়।' এই ভাবে কথা বললে কন্যার মাতার আগ্রহ বাড়তে পারে।

অন্যের ইচ্ছায় বরণ বা দান করবে না। বরণকালে কন্যাকে দেখে অনেক কথা জানতে পারবে। বিবাহের জন্য বর উপস্থিত হলে—সেই সময়ে কন্যা যদি ঘুমিয়ে থাকে, আর তাকে বরণ করবে না। কারণ শয়ন অল্পায়ু সূচনা করে। রোদনকারিণী দুঃখভাগিনী হয়। গৃহ থেকে নিষ্ক্রমণকারিণী গৃহত্যাগিনী হয়।

যাস্ক নাম অশুভ তাকেও বরণ করবে না। যেমন ভঞ্জিকা, বিত্রাটিকা, মাতঙ্গিনী।

নিম্নলিখিত বর্ণনার কন্যাও বরণের অযোগ্য—

১। অপ্রদর্শিত—যাকে দেখানো হয় নি। মেয়ে 'অপ্রদর্শিত' হলে দোষের আশঙ্কা থাকে ২। দত্তা—অন্যকে দিবার জন্য প্রতিশ্রুতা ৩। ঘোনা—কপিনা, কন্যা 'কপিনা' হলে সে পতিঘ্নী হয় ৪। পৃষতা—শুক্লবিন্দযুক্তা—অর্থহানির কারণ ৫। বিনতা—স্কন্ধের দিকে অবশতা—দুঃশীলা ৬। বিকটা—অসংহত উরু যার—দুঃখভাগিনী ৭। শুচিদূষিতা—যে পিতার মুখে সৎকারের সময় আগুন দিয়েছে ৮। সাঙ্করিকী—পরপুরুষ দূষিতা ৯। ফলিনী ১০। মূকা (বোবা) ১১। স্বনুজা—নিজের বয়স অপেক্ষা যার বয়স তিন বছরেরও কম (দুই বা এক বছরের ছোট) এবং ১২। বর্ষকরী—যার হাত ঘামে। কন্যাবরণে এদের ত্যাগ করবে। ত্যাগের তালিকায় এরাও আছে—

নক্ষত্রাখ্যাং নদীনাম্নীং বৃক্ষনাম্নীঞ্চ গর্হিতাম্।
লকার রেফোপাণ্ডাশ্চ বরণে পরিবর্জয়েৎ ॥

নক্ষত্রনাম্নী—যেমন শ্রবণা, বিশাখা, অশ্বিনী ;

নদীনাম্নী—যেমন গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ;

বৃক্ষনাম্নী—প্রিয়ঙ্গু, মালতী, মল্লিকা, কেতকী ;

লকাররেফোপান্তাঃ—যাদের নামের শেষ স্বরবর্ণের পূর্ব বর্ণ ল-র—যেমন চারু, হারু, কমলু, বিমলু।

বরণের ব্যাপারে এই সব কন্যাকে বর্জন করবে।

কেউ কেউ বলেন যাকে দেখলে মন ও চক্ষুর প্রীতি হয় তাকেই পত্নী রূপে গ্রহণ করলে ধর্ম, অর্থ ও কামপ্রাপ্তি হবে। অন্য কন্যা যদি লক্ষণযুক্ত হয় অথচ মন ও চক্ষুর প্রীতিকরী না হয় তাকে আদর করলে লাভ নেই।

যে দেশে যেরূপ প্রকৃতি সে দেশে সেই প্রকৃতি অনুযায়ী ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য আর্য বিধির অন্যতম বিধি অনুযায়ী যথাশাস্ত্র সেই কন্যাকে বিবাহ করবে।
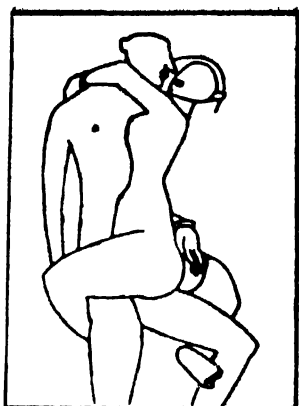
দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রয়োগ বিধি

বরণ বিধি অনুযায়ী কন্যালাভ করলেও আগে তার মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে—তা না হলে সে সঙ্গমের যোগ্য হবে না।

এই জন্য দুজনেই ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে তিন রাত্রি ভূমিতে শয়ন করবে,—খাটে নয়। পরবর্তী সাত দিন একসঙ্গে স্নান ভোজন, নাটকাদি দর্শন, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ—এ সবই চলবে। ধীরে ধীরে বিশ্বাস সৃষ্টির জন্যই এই বিধি।

দশম দিনের রাত্রে চেষ্টা শুরু করা যেতে পারে—প্রথমে মৃদু আলাপ, স্পর্শ এ ছাড়া কিছু নয়। তিন রাত্রি কথা না বলে থাকায় বা পরবর্তী সাতদিনও কোনো কামভাব প্রকাশ না করায় কন্যার মনে নানা রকম বিসদৃশ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। হয় তো ভাবতে পারে—'কোথাকার এক গেঁয়ো ভূতের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে!' হয় তো ভাবতে পারে—'নিশ্চয়ই লোকটা ক্লীব!'

এই সব ধারণা যাতে না হয় তার জন্য সাধারণ ভাবে একটু চেষ্টা করার কথাই এখানে বলা হচ্ছে; বিশ্বাস সৃষ্টির পথেই এগুতে হবে, ব্রহ্মচর্য স্খলন করা চলবে না। জোর করে কিছু করতে যাওয়াও অন্যায় হবে।

রমণী কুসুমকোমল—সুতরাং তাদের সম্পর্কিত ব্যবহারও কোমল হবে—এইটাই বাঞ্ছনীয়। তাদের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি না করে,

অনুরূপ আগ্রহ না জাগিয়ে যদি জোর করে কিছু করা হয় তবে কন্যা সঙ্গমবিদ্বেষী হয়ে উঠতে পারে।

সুতরাং প্রথম প্রচেষ্টা খুবই মৃদু হওয়া প্রয়োজন। প্রথমে একটু আলিঙ্গন।

অবশ্য এই আলিঙ্গন ক্ষণস্থায়ী হবে—দীর্ঘস্থায়ী আলিঙ্গন কন্যাদের অপ্রিয়।

দেহের উর্ধ্বভাগ দিয়ে প্রথমে আলিঙ্গন করবে তা তারা সইতে পারবে। আলিঙ্গন অন্ধকারেই প্রশস্ত।

এর পর কন্যার অধরে চুম্বন।

এই চুম্বন যেন মৃদু, সুখস্পর্শ এবং বিনা শব্দে সম্পাদিত হয়। চুম্বনের পর কন্যাকে আলাপের মধ্যে টেনে আনতে চেষ্টা করবে।

সেই সময়ে সে যা দেখেছে বা শুনেছে তার সম্পর্কেই ছোটো ছোটো প্রশ্ন—বর ভাণ করবে যেন সে কিছুই জানে না। নানা চাটুবাক্য বলবে—তবু যদি সে চুপ করে থাকে তবে জেদ করবে। আলাপের মধ্যে নিয়ে এলে সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ সহজ হয়ে আসবে।

কেউ কেউ বলেন, জেদ করলে কন্যা বিরূপ হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু বাৎস্যায়ন বলেন—পুরুষের কথায় কোনো ক্রমেই কন্যার বিরাগ হতে পারে না। আসলে কথা বলতে ইচ্ছা থাকলেও ওরা লজ্জায় কথা বলতে পারে না।

এই ভাবে যখন পরিচয় গাঢ় হয়ে আসবে তখন খুব কোমল ভাবে তার স্তন স্পর্শ করবে। সে যদি নিষেধ করে, তুমি বলবে, 'বেশ, তুমি আমাকে আলিঙ্গন কর তা হলে অমন কাজ করব না।' এই বলে নিজেই তাকে আলিঙ্গন করবে। নিজের হাত প্রায় নাভি পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে—তারপর ক্রমশ তাকে অবসর বুঝে নিজের ক্রোড়ে তুলে নেবে।

এই ভাবে প্রথম রাত্রি।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাত্রে হস্তযোজনার কাজে একটু বেশী অগ্রসর হবে।

হস্তযোজনা কি ? সংক্ষেপে সংবাহনের কাজ। কন্যার কোমরে, উরুতে ও কটিদেশে। উরুর উপর হাত রেখে সুখদায়ক রীতিতে মর্দন করবে—অপরপক্ষ বাধা দিলে বলবে—'এতে আর দোষ কি !' সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নেবে। ক্রমশ নায়িকার তা সহ্য হয়ে আসবে। তখন নায়ক নায়িকার মেখলা খুলে দেবে, নীবিবন্ধন শিথিল করে অঙ্গমর্দনের কাজ চালিয়ে যাবে। ক্রমে উরু থেকে উরুমূলে। কিন্তু অধীর হলে চলবে না।

কথা প্রসঙ্গে নায়িকাকে কামকলায় শিক্ষা দিতে হবে—ইঙ্গিতে ও আকারে নিজের অনুরাগ ব্যক্ত করতে হবে।

কালক্রমে দেখা যাবে নায়িকা তার কন্যাভাব ত্যাগ করেছে—তখন তার মনে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ সৃষ্টি না করে নায়ক উদ্যোগী হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম আরম্ভ—ইঙ্গিতাকার তত্ত্ব
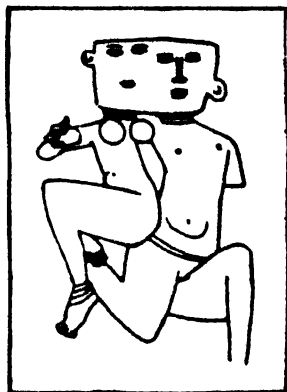
বরণ বিধান অনুযায়ী যে কন্যা অধিগত হয়েছে তার বিষয়ে এ পর্যন্ত বলা হয়েছে। কিন্তু যদি বরণের যোগ্য কন্যা না পাওয়া যায়? সেখানে অবশ্য গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ—এই চার প্রকার বিবাহের বিধান আছে।

অলব্ধ কন্যাকে লাভ করতে হলে নায়ক কিভাবে উদ্যোগী হবে? কোন্ পথে প্রথম আরম্ভ করবে?

কন্যার নিকট যে নারী বিশ্বস্ত, নায়ক তাকেই নির্বাচন করে তার সঙ্গে প্রীতির ভাব স্থাপন করবে। কন্যার ধাত্রীর যে দুহিতা তাকে নির্বাচন করাই নিরাপদ। ধাত্রীর কন্যা নিশ্চয়ই নায়কের অভিপ্রায় বুঝতে পারবে—কিন্তু সে নায়ককে প্রত্যাখ্যান না করে নায়িকার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারে। ধাত্রীর কন্যাকে মুখ ফুটে বলতে হবে না—'তুমি এই কামযজ্ঞের আচার্য কর্ম কর', সে অভিপ্রায় বুঝেই কাজ করতে পারবে। সে নায়িকার কাছে নায়কের গুণ বর্ণনা করে নায়িকাকে নায়কের প্রতি অনুরাগিণী করতে পারে। সে যদি নায়কের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন হয়—তবে এ কাজ সে অনায়াসে করতে পারবে।

নায়কের কি কর্তব্য? নায়িকার যে যে বিষয়ে অভিলাষ তা

জেনে সে পূরণ করবে। মধ্যে মধ্যে সে নায়িকার কাছে বিচিত্র উপহার পাঠাবে—এমন সব বস্তু, যা দুর্লভ এবং অন্য নায়িকার কাছে নেই। সম্ভব হলে নায়িকাকে প্রচ্ছন্ন ভাবে দান করাও কর্তব্য। প্রকাশ্য ভাবে যা দেওয়া চলে তা প্রকাশ্য ভাবেই দিতে হবে—তা না হলে প্রচ্ছন্ন ভাবে।

সুবিধা বুঝে নায়িকার সঙ্গে একবার গোপনে সাক্ষাতের প্রার্থনা ধাত্রীকন্যার কাছে করা যেতে পারে। নিভৃত স্থানে দেখা হলে গোপনে তাকে মনের কথা বলতে চেষ্টা করবে। যে সমস্ত গল্পে নায়িকার অনুরাগ আছে বলে মনে হবে—সেই সমস্ত সুন্দর গল্প সে তাকে শোনাবে। নায়িকা যদি গান ভালোবাসে—গান শুনিয়ে সে তার মনোরঞ্জন করবে। গানে কে না মুগ্ধ হয়? অনুকূল পরিবেশে সুনির্বাচিত সঙ্গীত নায়িকার চিত্তজয়ের পক্ষে এক প্রধান অস্ত্র। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে, উৎসবে, নিভৃত সন্ধ্যায় নায়ক নায়িকার কাছে সুরের মায়ালোক সৃষ্টি করতে পারে। বিভিন্ন কামকলা শিক্ষা দিয়ে ধাত্রীকন্যা নায়িকার কাছে নিজের রতি-বিষয়ক অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে পারে। নায়ক নিজে উদার বেশ গ্রহণ করবে তাতে যেন শালীনতার পরিচয় থাকে—তার বেশভূষা দেখে নায়িকা যদি অনুরাগ প্রকাশ করে তা তার ইঙ্গিত ও আকারের দ্বারাই নায়ক বুঝে নিতে পারবে।

নায়িকার ইঙ্গিত ও আকারের দ্বারা তার অনুরাগ নায়ক বুঝে নিতে পারবে—এই কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেই ইঙ্গিত ও আকার কি প্রকার?

শারীরিক ও মানসিক ভেদে ইঙ্গিত দুই রকম। শারীরিক ইঙ্গিত—কটাক্ষ প্রভৃতি; মানসিক ইঙ্গিত—বাক্য প্রয়োগে প্রকাশিত।

কত রকম ইঙ্গিতে নায়িকা তার মনের ভাব প্রকাশ করে। নায়ককে দেখতে চায় অথচ দেখা হলে লজ্জায় ভেঙে পড়ে। সুন্দর

দেহলাবণ্য তার বস্ত্রের আড়ালে ঢাকতে গিয়েই যেন অধিক ব্যক্ত করে দেয়। নায়ক একা থাকলে কিংবা দূরবর্তী হলে সতৃষ্ণ নয়নে দেখতে থাকে। কোনো প্রশ্ন করলে একটু মৃদু হেসে অস্ফুট ভাবে অধোমুখী হয়ে অর্থহীন কথা বলতে থাকে। নায়কের কাছে থাকতে চায়—নায়কের কথা যদি অন্য কেউ বলতে থাকে তবে তা মন দিয়ে শোনে। নায়ককে দেখিয়ে ক্রোড়স্থিত শিশুকেই মত্তভাবে আলিঙ্গন ও চুম্বন করতে থাকে।

যদি নিজে অলঙ্কৃত বা সুসজ্জিত না থাকে তবে নায়কের দৃষ্টিপথ থেকে সরে যায়। নায়ক তাকে যা দিয়েছে সকল সময়ে সযত্নে সে তা নিজের দেহে ধারণ করে।

এই সকল ইঙ্গিতের অন্তরালে রয়েছে গভীর প্রেম। সুতরাং আকার ও ইঙ্গিতের তত্ত্ব নায়ককে বুঝতে হবে এবং সেইভাবে উদ্যোগী হতে হবে।
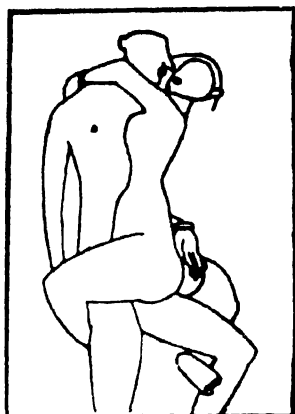
চতুর্থ অধ্যায়

উদ্যোগ

যে কন্যা ইঙ্গিত ও আকারের সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত করেছে তাকে লাভ করার জন্য উদ্যোগী হতে হবে।

এই উদ্যোগ দু'রকম—বাহ্য ও আভ্যন্তর।

বাহ্য উদ্যোগের কথা প্রথমে আলোচিত হচ্ছে—

জলক্রীড়া কালে নায়িকার কিছু দূরে জলে ডুব দিয়ে তার কাছে গিয়ে তাকে স্পর্শ করে সেইখানেই ভেসে উঠবে—

বিষণ্ণ কণ্ঠে নিজের দুঃখের কাহিনী কীর্তন করবে।

অন্য কথাচ্ছলে নায়িকা সম্পর্কিত নিজের দেখা স্বপ্নের কাহিনী বলবে—

যাত্রা-নাচ-গান ইত্যাদির আসরে প্রেক্ষাগৃহে নায়িকার কাছেই বসবে এবং অন্যের আড়ালে নায়িকাকে স্পর্শ করবে।—

তার অঙ্গে নিজের অঙ্গ স্থাপন করছি—ইঙ্গিতে বোঝাবার জন্য নিজের চরণের দ্বারা নায়িকার চরণ পীড়িত করবে।

এতে সিদ্ধ হলে বিজনে যাতে নায়িকার উদ্বেগ না হয় সেই ভাবে আকারের সাহায্যে নিজের যথার্থ ভাব নিবেদন করবে। আকারের সাহায্যে কেন? বাক্যের সাহায্যে ভাব প্রকাশ করলে প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা থাকে।

নায়িকার মনের ভাব জানার পর **আভ্যন্তর উদ্যোগ**।

নিজের অসুখ হয়েছে এই ছল করে নায়িকাকে নিজের গৃহে আনাবে। এলে বলবে—'ভীষণ মাথায় যন্ত্রণা, একটু টিপে দাও।'

তারপর নায়িকার হাত নিয়ে নিজের ললাটে ও নয়নে স্থাপন করবে।

নায়িকা ঔষধের কথা তুলতেই তুমি বলবে—না, না, ঔষধের দরকার নেই। তুমি এলেই, তুমি হাত বুলিয়ে দিলেই আমি ভালো হয়ে উঠব।—এতে নায়িকা বুঝতে পারবে, তার জন্যই নায়কের এই অবস্থা।

যখন নায়িকা চলে যাবে—তখন বলতে হবে—আমার জন্য এটুকু তোমার করতে হবে—তুমি ছাড়া এ কাজ আর অন্য কারও নয়। তিনটি সন্ধ্যা একটু কষ্ট করে আমার কাছে এসো।

যেখানে পুরুষের পক্ষে নায়িকাকে কাছে আনা সম্ভব হবে না সেখানে ধাত্রীকন্যা বা নায়িকার উপর প্রভাবশালিনী কোনো সখীর সাহায্য নিতে হবে। সে অন্য কোনো ছল করে নায়িকাকে নায়কের পাশে এনে দিতে পারবে।

অবশ্য, এমন ব্যবস্থাও হতে পারে যে নায়কের পরিচারিকাই নায়িকার অন্যতমা সখী। সেক্ষেত্রে নায়িকাকে কাছে আনার কাজটি আরও সহজ হবে নিশ্চয়ই।

যাত্রায়, উৎসবে, প্রেক্ষাগৃহে যে ইঙ্গিত ও আকারে আপন মনের ভাব ব্যক্ত করেছে, একাকিনী অবস্থায় একটু উদ্যোগী হলে তাকে অঙ্কশায়িনী করা কঠিন হবে না।
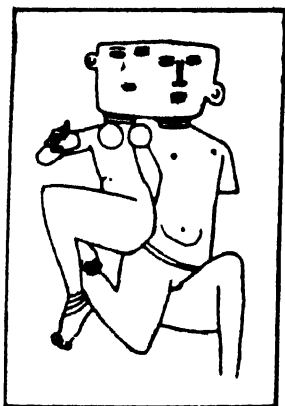
পঞ্চম অধ্যায়

গান্ধর্ব বিবাহ

এইভাবে অনুরঞ্জিত হয়ে যে নায়িকা স্বয়ংবরে প্রবৃত্তা—তাকেই গান্ধর্ব বিবাহযোগ্যা মনে করবে। এই বিবাহ পদ্ধতি প্রায়শঃ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে গান্ধর্ব বিবাহবিধি আলোচিত হচ্ছে।

যদি কন্যার দর্শন সুলভ না হয় তবে উপযুক্ত উপচার সহ ধাত্রীকন্যাকে পাঠানো হবে কন্যার নিকটে। সে নায়কের গুণবর্ণনা ক'রে কন্যাকে অনুরঞ্জিত করবে। নায়কের এমন সব গুণবর্ণনা করবে যা নায়িকার পক্ষে অত্যন্ত রুচিকর। কন্যার অন্য প্রার্থী যদি কেউ থেকে থাকে তবে তার দোষগুলিও নায়িকার সামনে তুলে ধরবে। বলবে—'সাধারণতঃ বিবাহের ব্যাপারে মাতাপিতা গুণ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকেন—অর্থের সংগ্রহই তাঁদের বিচারে প্রধান—বন্ধু-বান্ধবগণও চঞ্চলমাত, তাঁদের মতের কোনো স্থিরতা নেই।'

এই বলে সেই ধাত্রীকন্যা আনবে শকুন্তলা প্রভৃতি স্বয়ংবৃত্তা নারীদের প্রসঙ্গ—যে সব নারী নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী পতি নির্বাচন করেছিল—এবং সেই নির্বাচন পরে গুরুজন অনুমোদন করেছিলেন।

আরও কিছু বলবে সেই দূতীরূপিণী ধাত্রীকন্যা—সে বলবে, 'মাতা-পিতা হয়তো মহাকুলে দান করতে পারেন কিন্তু সপত্নীরা

সেখানে পীড়ার কারণ; একমাত্র পত্নী হলে তার পরিণাম সুখময়, সেখানে দু'পক্ষেরই অনুরাগে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না।

এই ভাবে বলার পর যখন দূতী বুঝতে পারবে, নায়িকার মনে অনুরাগ জন্মেছে কিন্তু লজ্জায় নিজে কিছুই করতে পারছে না তখন উপায় বলে দিয়ে সে তার লজ্জা ও আশঙ্কার অবসান ঘটাবে। সে বলবে—তুমি যেন কিছুই জানো না—এই ভাবেই থাকবে, নায়ক এসে তোমাকে জোর করে নিয়ে যাবেন। বিবাহের পর গুরুজনের অনুমতি পেতে অসুবিধে হবে না। নায়িকা স্বীকৃত হবে, নায়ক তখন তাকে কোনো এক নিভৃত স্থানে নিয়ে যাবে। তারপর কোনো এক শ্রোত্রিয়ের গৃহ থেকে সংস্কারপূত অগ্নি আনাবে। অগ্নিতে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী হোম করে সেই অগ্নিকে দুজনেই তিনবার প্রদক্ষিণ করবে।

এইভাবে **গান্ধর্ব বিবাহ** সমাপ্ত হবার পর কন্যার পিতামাতাকে জানাবে।

কেবল যে বিবাহ করে প্রকাশ করবে তা নয়—কন্যাকে সঙ্গম-দোষে দূষিত করে ধীরে ধীরে স্বজনবর্গের নিকট সেই সংবাদ ব্যক্ত করবে। তখন কুলকলঙ্কের কথা ভেবে এই বিবাহকে কন্যার স্বজনগণ মেনে নিতে আর দ্বিধা করবেন না। তারপর বিভিন্ন প্রীতি-উপহার ও অনুরাগের মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজন ও বান্ধবদের প্রসন্ন করা কঠিন হবে না।

স্বয়ং পাণিগ্রহণ করতে নায়িকা যদি অস্বীকৃত হয় তবে কোনো কুলস্ত্রীকে দ্রব্যোপহারের দ্বারা প্রসন্ন করে তারই সাহায্যে অন্য কার্যের ছলে নির্দিষ্ট স্থানে আনাবে—তারপর শ্রোত্রিয়ের গৃহ থেকে অগ্নি আনিয়ে পূর্বের মতোই বিবাহ সমাপ্ত করবে। **এরই নাম আসুর বিবাহ।**

অথবা সমান বয়স্কা গণিকাকে উপহার প্রভৃতি দ্বারা দীর্ঘকাল অনুরঞ্জিত করবে—পরে তাকে নিজের অভিপ্রায় গ্রহণ করাবে। প্রায়ই দেখা যায়, যুবকেরা সমান শীল, সমান ব্যসন এবং সমান

বয়স্ক বন্ধুদের প্রিয় কাজ সম্পাদনের জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। তাদের সাহায্যেই অন্য কার্যের ছলে নির্দিষ্ট স্থানে নায়িকাকে আনার ব্যবস্থা করবে—পরে উপযুক্ত সময়ে শ্রোত্রিয় গৃহ থেকে সংস্কৃত অগ্নি আনিয়ে বিবাহ সমাপ্ত করবে। এর নাম **রাক্ষস বিবাহ**।

সুপ্ত বা প্রমত্ত নায়িকার অভিগমন করে তাকে যে গ্রহণ করা যায় তাকে **পৈশাচ বিবাহ** বলে। ধাত্রীকন্যাদের সাহায্যে কন্যাকে আনিয়ে তাকে সুরাপান করিয়ে সংজ্ঞাহীন করতে হবে। সেই অবস্থায় অভিগমের দ্বারা তাকে দূষিত করে, পরে পূর্বোক্ত বিধান অনুযায়ী বিবাহ সমাধা করতে হবে।

পৈশাচ বিবাহ দু'রকমের হতে পারে।

দূষিত করার পর আত্মীয় স্বজনের নিকট ক্রমশ প্রকাশ করবে এবং নায়ক যাতে নিজে পায় তার জন্য যোগাযোগ করবে। এই এক প্রকার।

ধাত্রীকন্যার নিকটে নায়িকা সংজ্ঞাহীন; এই অবস্থায় তাকে দূষিত করে পরে বিবাহ করতে হবে।—এটি দ্বিতীয় প্রকার।

এতে অগ্নি আহরণের ব্যবস্থা করতে হয় না, কারণ এই বিবাহ অধর্ম।

গান্ধর্ব বিবাহ সুখের কারণ—এতে প্রায়ই কোনো ক্লেশ ভোগ করতে হয় না। এতে বরণ বিধান নেই এবং এটি অনুরাগাত্মক—এই সব কারণে গান্ধর্ব বিবাহকেই আচার্যগণ প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

তৃতীয় প্রসঙ্গ

ভার্যা

প্রথম অধ্যায়

এক

একচারিণী

ভার্যা দুই শ্রেণীর—একচারিণী আর সপত্নীকা। প্রাধান্য হেতু একচারিণী ভার্যার কথাই প্রথমে আলোচিত হচ্ছে।

গৃহচিন্তাই একচারিণী পত্নীর জীবনের সর্বস্ব। গৃহগুলি পবিত্র রাখার দিকেই তার লক্ষ্য থাকে। সেই জন্য তিনি গৃহের সকল স্থানই সাজিয়ে রাখেন। তার সুব্যবস্থায় গৃহের স্থানে স্থানে ফুল ছড়ানো থাকে, ভূতলের সর্বত্র মসৃণ থাকে আর সেই সকল স্থান শ্রী-যুক্ত থাকে।

গৃহস্থের পক্ষে এই সুন্দর গৃহ অপেক্ষা আনন্দজনক আর কি হতে পারে? তার গৃহিণীর যত্নে গৃহের পাশেই একটি ছোট ক্ষেত তৈরি হয়েছে—সেখানে আদা, বিভিন্ন শাক, এবং জিরে, সরষে প্রভৃতি মসলার চারা; আর একটি পুষ্পোদ্যানও সঙ্গেই আছে—সেখানে আমলকি, মল্লিকা, জাতি, নবমালিকা, টগর—আরও অনেক ফুলের গাছ।

বাড়ির মধ্যেই একটি কূপের ব্যবস্থা আছে কিনা সেদিকে একচারিণী পত্নীর নিশ্চয়ই লক্ষ্য থাকবে; স্থান সঙ্কুলান যদি হয় তবে একটি পুকুর কাটাবার ব্যবস্থাও তিনি করবেন।

রন্ধনবিদ্যায় তিনি সুদক্ষা—কোন্ খাদ্যটি পতির প্রিয়, কোন্

খাদ্যে পতির রুচি নেই—এ সব তত্ত্ব তার জানা। বাইরে পতির কণ্ঠস্বর শোনা যেতেই তিনি আঙিনায় এসে দাঁড়াবেন—কেননা তখন কি করতে হবে, পতির কি চাই—তা তিনি জানেন। ভৃত্যকে সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজে স্বামীর পা ধুইয়ে দেবেন।

স্বামী অধিক ব্যয় করতে থাকলে কিংবা অসৎ ভাবে অর্থের অপব্যয় করতে থাকলে তিনি তাকে বুঝিয়ে সব ঠিক করে দেবেন। কোনো উৎসবে, দেবমন্দিরে বা অন্য কোথাও যেতে হলে তিনি স্বামীর অনুমতি নিয়ে যাবেন।

রাত্রিতে স্বামী শয়ন করলে পরে তিনিও শয়ন করবেন—কিন্তু স্বামী শয্যা ত্যাগ না করতেই তিনি উঠে পড়বেন। দিনে যতক্ষণ স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ না হয় ততক্ষণ উঠবেন না।

রান্নাঘর থাকবে আড়ালে কিন্তু দেখতে সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, সেখানে কোনো অন্ধকার থাকবে না। তাছাড়া রান্নাঘর বেশ সাজানো থাকবে—জিনিসপত্র সেখানে ছড়ানো থাকবে না।

স্বামীর অপরাধ হলে ক্ষুব্ধ হয়ে বেশী কিছু বলতে যাবেন না—যদি কিছু তিরস্কার করতেই হয় তবে একাকী পেলে বা বন্ধুজনের মধ্যে পেলে মৃদু তিরস্কার করবেন। দুর্বাক্য বলা, কঠিন দৃষ্টিতে তাকানো, মুখ বাঁকিয়ে কথা বলা—এ সব ত্যাগ করবেন। নির্জনে অন্য রমণীর সঙ্গে অনেকক্ষণ মন্ত্রণা করা বা থাকা—এ সবও বর্জনীয়। অলঙ্কার বা অনুলেপনের আতিশয্য বর্জন করে পরিমিত সাজসজ্জা ও অঙ্গরাগ গ্রহণ করবেন।

স্বামীর ব্রত ও উপবাসে নিজেও অংশ গ্রহণ করবেন; স্বামী বারণ করলে বলবেন—'এ বিষয়ে তোমার কিছু বলবার নেই।'

লবণ, তৈল, কিছু গন্ধদ্রব্য, কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ—যা কিছু তার কাছে দুর্লভ মনে হবে তা গৃহে প্রচ্ছন্ন ভাবে সঞ্চিত রাখবেন—যাতে সময় মত পাওয়া যায়।

তেমনি আলু, পালং শাক, আমড়া, কাঁকুড়, বেগুন, কুমড়া, লাউ, সীম, রশুন, পেঁয়াজ—এ সকলের বীজ যথাকালে সংগ্রহ করে সেই বীজ বপন করবেন।—কারণ অসময়ে অতিরিক্ত ব্যয় করেও বীজ পাওয়া না-ও যেতে পারে। নিজের সম্পদের সংবাদ বা স্বামী যে মন্ত্রণার কথা বলবেন—তা বাইরে অন্যের কাছে প্রকাশ করবেন না। সারা বছরের আয়ের পরিমাণ স্থির করে সেই অনুযায়ী ব্যয় করবেন।

যারা স্বামীর মিত্র তাদের সংবর্ধনা করবেন। শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করবেন। তাঁদের অধীনে থেকে কথায় কথায় উত্তর দেবেন না; পরিমিত আলাপ, মৃদু কণ্ঠে হাসি—সংসার জীবনে এই হল আদর্শ নীতি। ভোগে গর্ব প্রকাশ করবেন না, পরিজনের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রকাশ করবেন। স্বামীকে না জানিয়ে অন্যকে কিছু দান করবেন না।

স্বামী কাছে থাকলে একচারিণীর কর্তব্য সম্পর্কে কিছু উপদেশ দেওয়া হল; এখন স্বামী প্রবাসী হলে তার কি করণীয় সেই সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

দুই

প্রোষিত-ভর্তৃকা

স্বামী প্রবাসী হলে একচারিণী পত্নীর এই ক'টি নিয়ম অবশ্য পালনীয়ঃ

১. কেবলমাত্র মঙ্গলকর আভরণ (অর্থাৎ লোহা বা খাড়ু) ধারণ করে দেবতার প্রীতির জন্য উপবাস পালন করবেন।

২. শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের নিকটে শয্যা রচনা করে শয়ন করবেন—গুরুজনের অভিমত অনুযায়ী কর্তব্য পালন করে যাবেন।

৩. নিত্যকর্মে যথোচিত ব্যয় করবেন; স্বামী যে যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন তা সমাপ্ত করার জন্য উদ্যোগী হবেন।

৪. কোনো বিপদ বা উৎসবের উপলক্ষ্য ছাড়া স্বামীর আত্মীয় সমাজে যাবেন না। গিয়ে অধিক কাল সেখানে থাকবেন না, প্রবাসের বেশও বর্জন করবেন না।

৫. স্বামী প্রবাস থেকে ফিরে এলে প্রথমে প্রবাসের বেশেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সপত্নী কথা

এক

জ্যেষ্ঠা সপত্নী
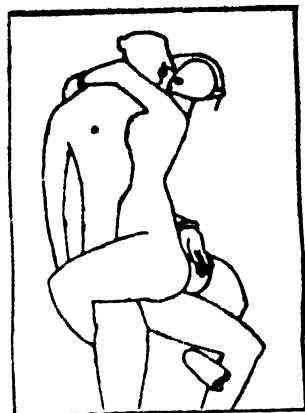
কিন্তু সেই একচারিণী পত্নী যখন সপত্নী পরিবৃত্ত হবেন তখন কি ভাবে আচরণ করবেন ?

প্রথমে জ্যেষ্ঠা সপত্নীর কথা—

সপত্নী এলে তাকে ভগ্নীর ন্যায় দর্শন করবেন। স্বামী যাতে জানতে পারেন এভাবে সপত্নীর রাত্রিতে কর্তব্য সংস্কার বিধি সযত্নে পরিচারিকার সাহায্যে করিয়ে দেবেন। তার সৌভাগ্যজনিত বিকার উপেক্ষা করবেন।

কিন্তু যদি সপত্নী স্বামীর সম্পর্কে কোনো ভুল করে বসে তা তিনি উপেক্ষা করবেন না।

তার পুত্র হলে সেই পুত্রকে নিজের পুত্রের মতোই আদর করবেন। পরিজনবর্গের প্রতি অধিক দয়া প্রদর্শন, মিত্রবর্গের প্রতি অধিক প্রীতি প্রদর্শন, জ্ঞাতিবর্গের প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন—এ সবও তাঁর অবশ্য কর্তব্য। অনেক সপত্নী হলে যে তার পরেই এসেছে প্রধানতঃ তার সঙ্গে মেলামেশা করবেন।

দুই

কনিষ্ঠা সপত্নী

কনিষ্ঠা সপত্নী জ্যেষ্ঠাকে মাতৃবৎ দর্শন করবেন। বাপের বাড়ির ধন,

অলঙ্কার যাতে জ্যেষ্ঠার অজানা না থাকে সেই ভাবে ব্যবহার করবেন। নিজের যা-কিছু কর্তব্য সব জ্যেষ্ঠার মত নিয়েই পালন করবেন। জ্যেষ্ঠার ভালো মন্দ কথা অন্য কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। তার সন্তানদের নিজের সন্তান অপেক্ষা অধিক ভালো বাসবেন।

এই 'অধিক ভালোবাসার নীতি' স্বামীর প্রতিও প্রযোজ্য—তবে নির্জনে অর্থাৎ গোপনে। গোপনে স্বামীকে তিনি অন্যের অপেক্ষা অধিক উপচারে সেবা করতে পারেন।

নিজের সপত্নী দুঃখ তো কিছু থাকবেই, কিন্তু সেই দুঃখ স্বামীর কাছে একেবারেই উত্থাপন করা চলবে না। অন্য পত্নীর তুলনায় একটু বেশী মান বা আদর স্বামীর কাছে পাওয়ার ইচ্ছে—তা-ও তিনি করতে পারবেন; তবে 'একটু বেশী পাওয়া' মান বা আদরের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করা চলবে না। গর্বের বশে কিংবা সপত্নীর প্রতি ক্রোধে তা ব্যক্ত হয়ে যেতে পারে।

তিন

পুনর্ভূ

অন্যপূর্বা

যে বিধবা ইন্দ্রিয় দুর্বলতা বশতঃ কামার্ত হয়ে ভোগী গুণসম্পন্ন পুরুষকে দ্বিতীয়বার পতিত্বে বরণ করেন তাকে পুনর্ভূ বা অন্যপূর্বা নারী বলে।

দ্বিতীয়বার পতিগৃহে এসে এই অন্যপূর্বা নারী অন্য পত্নীদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করে দিন যাপন করবেন।

সপত্নীদের কল্যাণ সাধনই তার কর্তব্য। তিনি তাদের সন্তানদের অলঙ্কার দিবেন। পরিজন ও মিত্রবর্গকে দান করবেন, তাদের সঙ্গে সপরিহাস ব্যবহার করবেন। গোষ্ঠীতে, উদ্যানবিহারে

ও যাত্রায় তাকে অধিক উৎসাহ এবং জ্ঞানের পরিচয় দিতে হবে—কামকলায় আরও অধিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

এই নারী যদিও সপত্নীদের অন্যতমা—তবুও তিনি অভিভাবিকার মতোই সংসারে বিচরণ করবেন।

চার
(দুর্ভগা—পতিস্নেহ বঞ্চিতা)

যে নারী পতিস্নেহবঞ্চিতা তাকে দুর্ভগা বলে।

পতিস্নেহবঞ্চিতা নারী সপত্নীদের দ্বারাও পীড়িতা হন—তার কি করণীয়?

১. সপত্নীদের মধ্যে যে স্বামীর অধিক মনোরঞ্জন করতে পারে, তারই আশ্রয় নেবে। তার আশ্রিত থেকে নানা প্রকার কলাকৌশল প্রয়োগ করতে পারে।
২. স্বামীর সন্তানদের নানাভাবে সেবা করবে। যেমন—তেল মাখানো, গন্ধদ্রব্য লেপন, স্নান করানো—এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজ।
৩. স্বামীর যারা মিত্র তাদের প্রিয় এবং হিতকর কর্ম করবে।
৪. গৃহে যে সব ধর্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়—তাতে সে প্রথম উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসবে। ব্রত-উপবাস করবে।
৫. পরিজনের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য প্রকাশ করবে। সপত্নী ও পরিজনের নিকটে নিজেকে 'বড়ো' করবে না।

এ সব বাহ্য উপায়; আভ্যন্তর উপায়গুলি আলোচিত হচ্ছে।

১. শয়নকালে স্বামীর আনুকূল্য করবে এবং তা করতে গিয়ে নিজের অনুরাগ ফিরিয়ে আনবে; নিজের কাম্য না হলেও স্বামীর তৃপ্তি হওয়া পর্যন্ত অনুরাগ দেখাবে।
২. 'আমি তোমার অপ্রিয়া, 'আমি তোমার চক্ষুশূল'—এ সব' কথা বলে স্বামীকে তিরস্কার করবে না। নিজের 'অঙ্গ'

ঢেকে রেখেও বিরূপতা দেখাবে না।

৩. যদি কারও সঙ্গে স্বামীর কলহ হয়—তবে তাকে বুঝিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে স্বামীর প্রতি তাকে অনুকূল করে তুলবে।

৪. স্বামী যাকে গোপনে কামনা করেন তার সঙ্গে স্বামীর সঙ্গমের ব্যবস্থা করবে—এবং এ ব্যাপার গোপন রাখবে। যদি পরস্ত্রীকে কামনা করেন 'দূতীকর্ম' করে স্বামীর সঙ্গে মিলন করাবে।

৫. যাতে স্বামী মনে করেন—তুমি পতিব্রতা, তোমার মধ্যে কোনো শঠতা নেই সেইভাবে আচরণ করবে।

সপত্নীপীড়িতা নারীদের মধ্যে যারা দুর্ভগা অর্থাৎ পতি-স্নেহবঞ্চিতা তাদের পক্ষে এই আচরণ বিধি।

পাঁচ

অন্তঃপুরিকা

এখানে অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীগণের কর্তব্য নির্ণীত হচ্ছে। অন্তঃপুরেও একচারিণী আছে, জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠাও আছে, তাদের সম্পর্কে আর পৃথক করে বলবার প্রয়োজন নেই; তবে রাজার সম্পর্কে কিছু বলার আছে।

কঞ্চুকীগণ অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীগণের কাছ থেকে মালা, অনুলেপন বস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে এসে রাজাকে উপহার দেবে—বলবে 'দেবীরা এই সব পাঠিয়েছেন।' রাজা সব গ্রহণ করবেন—তার নির্মাল্য সেই সব স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেবেন—কঞ্চুকীরাই তা নিয়ে যাবে। অপরাহ্নে নিজে অলঙ্কৃত হবেন, অন্তঃপুরচারিণীরাও অলঙ্কৃতা হবেন—তারপর যোগ্যতা অনুযায়ী এবং যার সঙ্গে যে কাল নির্দিষ্ট আছে সেই ভাবে সাক্ষাৎ করে 'পূজা' গ্রহণ করবেন। প্রথমে দেবীর, পরে অন্যপূর্বা (পুনর্ভূ) স্ত্রীর, পরে গণিকা, শেষে অন্তঃ-পুরিকাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাজা যখন দিনের বেলা শয্যা ত্যাগ করবেন—তার কাছে কতকগুলি সংবাদ জানাতে হবে—কার নির্দিষ্ট বাসের সময় সম্প্রতি অতীত হয়েছে আর কার ঋতুকাল উপস্থিত—তাদের পরিচারিকারাই এই সব সংবাদ নিয়ে আসবে রাজার কাছে। তাদের সঙ্গে থাকবে অনুলেপন আর ঋতুকাল সম্পর্কিত তথ্য। তাদের মধ্যে রাজা যেটি তুলে নেবেন সেদিন তার বাস নির্দিষ্ট হবে।

১. উৎসবে ও সঙ্গীতে সকলের পূজা ও পানের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

২. অন্তঃপুরচারিণীর বাইরে বেরিয়ে আসা আর বাইরের রমণীদের (গণিকা প্রভৃতির) ভিতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

৩. অবশ্য শুচি থাকলেই এই ব্যবস্থা ; অশুচি থাকলে অন্যথা করা চলবে। ঋতুকালীন সেবা নিন্দনীয় নয়।

ছয়

রাজার যেমন বহু স্ত্রী থাকতে পারে, নগরবাসীদেরও একাধিক স্ত্রী থাকা সম্ভব। সেই ক্ষেত্রে অর্থাৎ একাধিক পত্নী থাকলে পুরুষের কিরূপ আচরণ হবে, এখানে তারই নির্দেশ—

১. বহু পত্নী গ্রহণ করলে সকলের নিকট সমান ভাবে থাকতে হবে। কারও উপর অবজ্ঞা প্রকাশ করা চলবে না।

২. তাই বলে তাদের অপরাধ সহ্য করাও অন্যায় ; ক্ষমা করলে ওরা আবার সেই অপরাধই করবে।

৩. একজনের সঙ্গে মিলিত হলে যে রতিক্রীড়া, দেহের বিকৃতি বা প্রণয়কলহ বশতঃ যে তিরস্কার প্রভৃতি হবে তা অন্যের নিকটে প্রকাশ করবে না।

৪. প্রকাশ করলে তা অন্যের বৈরাগ্যের কারণ হতে পারে।

৫. সপত্নীদের মধ্যে বিবাদ হলে যদি একজন অভিযোগ করে তবে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়। বলবে, 'এতে তোমারই

তো দোষ দেখতে পাচ্ছি'—এই ভাবে তাকেই তিরস্কার করবে।

৬. সকল স্ত্রীরই মনোরঞ্জন করতে হবে—যে লজ্জাবতী তাকে বিশ্বাসের দ্বারা, যে সপত্নীর সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায় তাকে সকলের সমক্ষে পূজা করে, এবং যে মনস্বিনী তাকে গৌরব দান করে।

৭. যে উদ্যানে ভ্রমণ করতে চায় তাকে উদ্যান ভ্রমণের সুযোগ দিয়ে, ভোগের কামনা যার আছে তাকে ভোগের উপকরণ দিয়ে, যে জ্ঞাতিপ্রিয় তার কাছে তার জ্ঞাতির সম্মাননা করে, যে রতিপ্রিয়া তাকে সঙ্গমের আনন্দ দিয়ে—এই ভাবে সকলের মনোরঞ্জন করতে হবে।

যদি কোনো যুবতী ক্রোধকে বশীভূত করে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী আচরণ করে তবে সে পতিকে বশ করে সপত্নীদের উপরে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারে।

চতুর্থ প্রসঙ্গ

বারবনিতা

প্রথম অধ্যায়

এক

সহায়গম্য
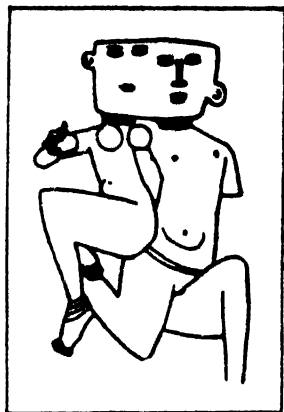
যাদের পেতে গেলে সাহায্যের দরকার

পুরুষ ও গণিকা—উভয়েরই রতিফল সমান। তবুও গণিকা প্রয়োগকারিণী—সুতরাং এই রতিতে তারই অধিকার, পুরুষের নয়। তাছাড়া এই রতির অধীন তার জীবিকা।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে পুরুষ পাওয়া গেলে তবেই গণিকার রতিসুখ এবং জীবিকালাভ—দুইই হতে পারে। রতিসুখের জন্য প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, কিন্তু অর্থের জন্য প্রবৃত্তি কৃত্রিম।

গণিকা এমন ভাবে আচরণ করবে যাতে পুরুষ বুঝতে পারে সে কামতৃপ্তির জন্যই ব্যাকুল—অর্থ কিছু নয়। কেননা, কামার্তা নারীতে পুরুষ অধিক আসক্ত হয়ে থাকে। অর্থের জন্য একেবারেই লোভ প্রকাশ করবে না।

প্রতিদিন অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে তাকে বসে থাকতে হবে—পুরুষের আশায়। লক্ষ্য রাখবে রাজপথের দিকে। এমন ভাবে বসবে যাতে সে অতি-প্রকাশিত না হয়ে পড়ে, কেননা গণিকা আসলে বিক্রয়ের পণ্য, তার অনেকটা প্রকাশিত থাকবে, কিছুটা অপ্রকাশিতও থাকবে—তবেই পুরুষের দর্শন-লালসা বাড়বে।

এ ব্যাপারে কারা গণিকার সহায় ?

যারা পুরুষদের জুটিয়ে আনতে পারবে, তারাই শ্রেষ্ঠ সহায়। তারা পুরুষদের অন্য গণিকার নিকট যেতে দেবে না। অনর্থ ঘটলে তার প্রতিকার করবে, আর সব রকমে তাকে সাহায্য করবে। এই সব সহায়কে হতে হবে শক্তিশালী, বীর, সমান বিদ্যাসম্পন্ন এবং কলারসিক—মালাকার, বিদূষক, গন্ধব্যবসায়ী, গণিকাসক্ত, রজক, নাপিত এবং ভিক্ষুকগণও এই কর্মে নিযুক্ত হতে পারবে, কেননা তারা পরগৃহে সহজে যেতে পারবে, পুরুষদের উৎসাহ দিয়ে নিয়ে আসাও তাদের পক্ষে সম্ভব। অবশ্য, এ ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিও এ কাজ করতে পারে।

কোন্ কোন্ পুরুষ প্রার্থনীয় ?

১. প্রথমে দেখতে হবে একে দিয়ে অর্থ সিদ্ধি হবে কি না।
২. সেই পুরুষ হবে তরুণ; তার বৃত্তি হবে প্রকাশ; সেই সঙ্গে দেখতে হবে, তার অর্থ কষ্ট করে উপার্জিত হয়েছে কিনা—উপার্জনে কষ্ট হলে ব্যয় সঙ্কোচ স্বাভাবিক।
৩. সে হবে এমন পুরুষ যে মনে করে ভাগ্যক্ষয়েই ধনের ক্ষয় হয়—উপভোগে নয়।
৪. তাকে হতে হবে এমন গুণবান যার নিকট অনায়াসে প্রীতি ও যশ লাভ করা যাবে।
৫. এই পুরুষ স্বাধীন হলেই ভালো কেননা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সে চলতে পারবে।
৬. এই পুরুষ হবে প্রচ্ছন্নকাম সন্ন্যাসী—বাইরে বৈরাগ্য কিন্তু অন্তরে ভোগের স্পৃহা।
৭. প্রয়োজনে চিকিৎসা করতে পারে এমন বৈদ্য হলে সেও প্রার্থনীয়। কেননা, অবস্থাবিশেষে সে চিকিৎসাও করতে পারবে। চিকিৎসক ধনবান না হলেও ক্ষতি নেই।
৮. যে সকল গুণবানের নিকট প্রীতি ও যশ লাভ করা যায়

তারাও প্রার্থনীয়।

পুরুষের (নায়কের) গুণ বর্ণিত হয়েছে—এবার নারীর গুণ—

রূপ, যৌবন, লক্ষণ, মাধুর্য, গুণে অনুরাগ কিন্তু অর্থে তেমন অনুরাগ নেই, প্রীতি সংযোগ ও মতির স্থিরতা।

এখন অ-গম্য চিন্তা ; অর্থাৎ যাদের সঙ্গে সঙ্গম বর্জনীয় তাদের বিষয়ে এখানে অলোচিত হচ্ছে।

যার রাজযক্ষ্মা বা কুষ্ঠরোগ আছে, যার শুক্র সংসর্গ-মাত্রেই স্ত্রী গর্ভবতী হয়—যার মুখে দুর্গন্ধ বা যে-কোনো স্ত্রীর সঙ্গে যে যৌনমিলনে উৎসুক, যে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসে, যে নির্দয়, যার বাক্য কঠোর, যে মান ও অপমানের অপেক্ষা করে না—এমন পুরুষ সঙ্গমে বর্জনীয়।

দুই

অগম্য চিন্তা

কি কি কারণে কখন সঙ্গম বরণীয় ?

স্বাভাবিক অনুরাগ, অর্থলাভ, এই ব্যক্তি রসজ্ঞ বলে শোনা যায় সেটি কি ঠিক ? —এই জিজ্ঞাসায়, দরিদ্র বা বিদ্বান ব্রাহ্মণ সঙ্গমার্থী হলে—তার প্রার্থনা পূরণ ধর্ম ; অনুকম্পা (তুমি যদি আমাকে কামনা না কর, আমি মৃত্যু বরণ করব—এমন কথা যে বলে তার উপর দয়ার বশবর্তী হয়ে), রাগাপনয় (হঠাৎ কামোদ্রেক হলে যে-কোনো ব্যক্তির সঙ্গে রমণ করে সেই কাম তৃপ্ত করা) প্রভাব (প্রভাবশালীর সঙ্গে রমণ করলে নিজের প্রভাব বৃদ্ধি হয়)— এই সব সঙ্গমের কারণ হতে পারে।

বাৎস্যায়ন বলেন, অর্থলাভ, অনর্থের প্রতিকার এবং প্রীতিই সঙ্গমের কারণ। প্রীতি দ্বারা অর্থের বাধা হতে পারে না কারণ অর্থেরই প্রাধান্য।

সহায় স্থির করার পর যার সঙ্গে সংসর্গ অভিপ্রেত তাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে।

এই অভিপ্রেত নায়ক নিজে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করলেও সহসা সঙ্গমে সম্মতি দিয়ো না, কেননা পুরুষেরা সুলভ বস্তুকে সম্মান করে না। নায়কের অভিপ্রায় কি তা স্পষ্টভাবে জানবার চেষ্টা করবে। এ ব্যাপারে পরিচারক, সম্বাহক (পীঠমর্দক) প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া চলতে পারে। এদের সাহায্যে নায়কের কিসে অনুরাগ, সে কিসে আসক্ত, কিসে অনাসক্ত, দান আছে কিনা, না কৃপণ—এ সব তথ্য সংগ্রহ করবে।

এরাই নানা ছলে নায়ককে নায়িকার গৃহে নিয়ে আসবে কিংবা নায়িকাকে নায়কের গৃহে নিয়ে যাবে। আগত নায়কের প্রীতি জন্মাবার চেষ্টা করবে—কোনো বিশেষ দ্রব্য নিজে তাকে দেবে, বলবে 'বস্তুটি সাধারণের উপভোগের বাইরে'—অর্থাৎ ভাবটি থাকবে এই রকম যে অ-সাধারণ বস্তুটিই আমি তোমার জন্য সংগ্রহ করেছি। তুমি হয়তো জানতে পেরেছ, কাব্যগোষ্ঠী বা কলাগোষ্ঠী—যে কোনো গোষ্ঠীতে নায়ক অত্যন্ত আসক্ত, তুমিও সেই জাতীয় গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান করে নায়ককে সেখানে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন উপচারে তার মনোরঞ্জন করবে।

একেই বাৎস্যায়ন বলেছেন—'প্রীতিযোগের বিধি।'

'বশীকরণের বিধি'ও আছে।

১. আগত নায়কের প্রীতি আকর্ষণের জন্য মালা, অনুলেপন থাকবে। গৃহে কলাগোষ্ঠীর ব্যবস্থা করবে।

২. প্রণয় সৃষ্টির জন্য প্রীতিকর বস্তু দান করবে। যদি প্রণয় জন্মে, উত্তরীয় বা অঙ্গুরীয় বিনিময় করবে। যদি প্রণয় না-ও জন্মে তাহলেও কপট প্রণয় জানাবার জন্য এই ব্যবস্থা।

৩. সঙ্গমের সঙ্কেত নিজে করবে, অন্যের দ্বারা করাবে না।

৪. প্রীতি যোগ, বাক্যের উপন্যাস (যেমন, রাত্রে আর কষ্ট করে

বাড়ি গিয়ে কি হবে—এইখানেই শুয়ে থাকুন না—এই জাতীয় বাক্যের প্রয়োগ) এবং মিলনসূচক উপচার—এই সকল উপায়ে নায়কের সঙ্গে সঙ্গমে মিলিত হবে। পরে তাকে অধিক মাত্রায় অনুরঞ্জিত করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কান্তানুরঞ্জন

আগের অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে তা আরও বিশদ করে বলা-ই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। নায়কের মনোরঞ্জন করতে হলে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হবে—

১. নায়ক তোমার বিপরীত দিকে মুখ করে শুয়ে আছে, এই অবস্থায় তুমিও আবার বিপরীতমুখী হয়ো না; নায়কের দিকে মুখ করে শুয়ে তাকে লক্ষ্য রাখবে। হয়তো মুখ ফেরাতে পারে।

২. নায়ক যদি তোমার গোপন স্থান স্পর্শ করতে ইচ্ছুক হন তবে তাতে বাধা সৃষ্টি করবে না বরং সাহায্য করবে।

৩. নায়ক ঘুমিয়ে পড়লে চুম্বন বা আলিঙ্গন—এ সব করতে পারো।

৪. নায়ক যখন অন্যমনস্ক ভাবে কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকবে তখন তুমি তাকে লক্ষ্য করবে; সে কিসের উৎকণ্ঠায় বা উদ্বেগে অন্যমনস্ক তা জানবার চেষ্টা করবে।

৫. নায়কের যা প্রিয় সে সম্পর্কে তুমি অনুরাগ প্রকাশ করবে; যাতে অরুচি তাতে তোমারও রুচি থাকবে না। সে সুখী হলে তুমি সুখী, দুঃখী হলে তুমিও দুঃখ পাবে।

৬. অন্য নারীতে নায়ক আসক্ত কিনা জানবার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করবে।

৭. কোপ প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু সেই কোপ যেন বেশীক্ষণ স্থায়ী না হয়।

৮. নিজেই যে সব দন্তক্ষত নখক্ষত প্রভৃতি করেছ তা দেখে সহানুভূতি জানাবে এই বলে—'আহা, কে এমন দশা করল?'

৯. নায়কের প্রতি অনুরাগ হয়ে থাকলে কখনও তা কথায় প্রকাশ করবে না। এ কথা বলবে না—'আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি, তুমি আমাকে নাও'। মত্ত অবস্থায় অথবা স্বপ্নে এ কথা বলে ফেলতে পারো—'তোমার সঙ্গে মিলন না হওয়াতেই শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

১০. নায়ক কোনো কথা বলতে থাকলে মন দিয়ে শুনবে অর্থাৎ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে আর হুঁ দেবে। নইলে মনে হতে পারে, তুমি অবজ্ঞা করছ। কথা শুনে, যদি প্রশংসার দরকার হয় তবে করবে—বলবে—'বেশ বলেছ, এ তো তোমার মতো লোকেরই কথা, এমন না বললে কি আর মনুষ্যত্ব থাকে?'

১১. নায়ক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লে বা হাই তুললে, কোনো কিছু ভুলে গেলে বা নিজে পড়ে গেলে চিন্তান্বিত হয়ে বলবে—'এখন আবার কোনো অসুখ না হলেই বাঁচি!'

১২. নায়কের অর্থলাভ হলে, অভিপ্রায় সিদ্ধ হলে বা স্বাস্থ্যের উন্নতি হলে বলবে—'আমি এর জন্য ইষ্টদেবতার কাছে কত প্রার্থনা করেছি। তিনি আমার প্রার্থনা পূরণ করেছেন—এবার ঘটা করে তার পুজো দেব।'

কান্তানুরঞ্জনের কথা এই পর্যন্ত। পরিশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। কাম চিত্তের ধর্ম—তাহা অতীন্দ্রিয়, সুতরাং অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ক্রিয়া দ্বারাও তার পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। লুব্ধা স্ত্রী স্বাভাবিক কামের বশবর্তী হয়েই যেন আচরণ করে, সুতরাং প্রবৃত্তি দেখে জানা কঠিন। পুরুষেরাও কামাপন্না স্ত্রীতে বিশ্বাস করে তাই

তাদের পক্ষেও স্বাভাবিক রাগাচরণ সম্ভব—তাই জানা কঠিন।

তারা কামনা করে কৃত্রিম কেলিবশে, তার পরক্ষণেই অনুরাগ বিরাগে পরিণত হয়। তারা কৃত্রিম কেলিতে নায়ককে রঞ্জিত করে—আবার কিছু দিন পরেই ত্যাগ করে সেই নায়ককে। গণিকা সর্বপ্রকারে গ্রহণ করে—তবু তাদের জানা যায় না। সুতরাং গণিকায় আসক্তি সর্বথা বর্জনীয়।

তৃতীয় অধ্যায়

এক

অর্থার্জনের উপায়
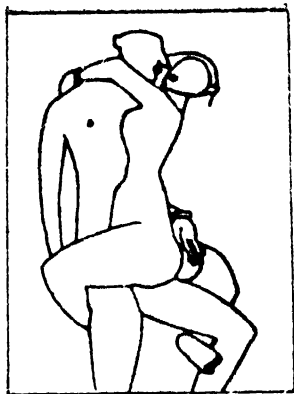
কান্তানুরঞ্জনের কথা বলা হয়েছে। এই ভাবে অনুরঞ্জিত নায়কের নিকট থেকেই অর্থ গ্রহণ করবে।

যে সব উপায়ের সাহায্যে অর্থ গ্রহণ করলেও অর্থের লোলুপতা প্রকাশ পাবে না—সেই সব উপায়ের কথা এখানে আলোচিত হচ্ছে—

১. অলঙ্কার, সুরা, বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি দ্রব্য যারা বিক্রয় করে তাদের মূল্য পরিশোধ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের কথা শুনিয়ে দাম আদায় করে নেবে।

২. ব্রত, উদ্যানোৎসব ও মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ছলে অর্থ আদায় করা সহজ। এ ছাড়া নানারকম প্রীতির দায় তো আছেই। যেমন—'আমার এত প্রিয় জন এতদিন পরে ঘরে এলো একে কিছু না দিলে কি চলে?'—এই সব বলে কিছু আদায় করা।

৩. গৃহ থেকেই 'সিঁদেল চোর এসে সর্বস্ব নিয়ে গেছে'—সর্বস্ব যাওয়ার ছলনা করে কিছু কি আদায় করা যায় না? নায়ক নিশ্চয়ই কিছু দেবে।

৪. ছলনায় কথাই যখন উঠল তখন বলা যেতে পারে—নারী ছলনাময়ী, ওদের কাছে ছলনার অভাব হয় না। কোনো

বন্ধুর বাড়িতে উৎসব হবে—হঠাৎ বলে বসবে, 'না আমি যাব না। উপহার দেবার যোগ্যতা নেই তো যাব কি!' আগেই অবশ্য শুনিয়ে রাখবে—আমাদের বাড়িতে যখন উৎসব হয়েছিল তখন ওরা কত উপহার নিয়ে এসেছিল—এখন আমি রিক্ত হস্তে কি করে যাব?' এতে সুফল ফলতে পারে।

৫. নায়কের জন্য কোনো অলঙ্কার তৈরি করাবে। বলবে—'শিল্পী সুন্দর কাজ করে বটে, তবে মজুরী একটু বেশী। অত মজুরী দেবার ক্ষমতা তো আমার নেই, তুমি যদি দাও তো জিনিসটা পছন্দ মতো করাতে পারি।'

উল্লিখিত এবং আরও অন্যান্য উপায়ে সক্তের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করবে। সক্ত কে?

যে সকল প্রকারে বিশ্বস্ত, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে যে সমান ভাবাপন্ন, যে নায়িকার প্রয়োজন জানা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে তার পূরণ করে, যে তার নিকটে কোনো কিছুর আশঙ্কা করে না এবং যে ব্যক্তি কোনো কিছুর অপেক্ষা রাখে না—সে সক্ত।

দেশ, কাল ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে সক্তের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করবে এই কথা বলা হল; কিন্তু যে বিরক্ত তার কাছ থেকে কি ভাবে অর্থ আদায় করবে? বিরক্তের লক্ষণই বা কি?

দুই

বিরক্ত-সংবাদ

সাধারণতঃ দুটি লক্ষণের সাহায্যে কে বিরক্ত তা জানতে পারা যায়—স্বভাবের বিকার এবং মুখের বর্ণ বিকৃতি।

স্বভাবের বিকার কিরূপ?

যা দেওয়া উচিত তার চেয়ে অল্প বা অতিরিক্ত দেয়; নায়িকার বিপক্ষ দলের সঙ্গে সে প্রীতি স্থাপন করে; একটি বিষয়ের স্থলে আর একটি বিষয়ের অনুষ্ঠান করে; প্রত্যহ দেয় অর্থ সে দেয় না; কোনো

জিনিস 'দিব' বলে প্রতিজ্ঞা করলে তা বিস্মৃত হয়—কিংবা অস্বীকার করে, বলে, 'কই, আমি তো দিব বলি নি।' মিত্রের সঙ্গে সঙ্কেতে কথা বলে; মিত্র কার্যের ছল করে অন্য নায়িকার সঙ্গে রাত্রি যাপন করে, পূর্বে যে নায়িকার সঙ্গে সম্পর্ক ঘটেছিল তার পরিজনবর্গের সঙ্গে নির্জনে কথাবার্তা বলে।

এই সব লক্ষণ দেখে স্থির করবে—নায়ক বিরক্ত। 'নায়ক যে বিরক্ত—এ সংবাদ নায়িকা জানতে পেরেছে'—এই তথ্য নায়ক উপলব্ধি করার আগেই নায়িকা নায়কের একটি মূল্যবান দ্রব্য হস্তগত করবে। এতেই কার্যসিদ্ধি হবে।

তিন
মুক্তির উপায়

'বিরক্ত' ব্যক্তি আপনা থেকেই চলে যায়, তাকে আর বিতাড়িত করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে 'সক্ত' সে নিজে যায় না।

যদি বা 'সক্ত' পূর্বে বহু উপকার করে থাকে তবু বর্তমানে অল্পদান করে এই মিথ্যা অভিযোগে অপরাধী করবে।

যদি অন্য নায়িকাকে সে কামনা করতে থাকে তবে তাকে নিয়েই এমন ষড়যন্ত্র করবে যাতে সে নিজেকে বর্তমান নায়িকার কাছে আসার অযোগ্য মনে করে। আর যদি সে 'অসার' অর্থাৎ বস্তুহীন হয়ে পড়ে যাতে নায়িকা তার কাছে কোনো লাভের আশা করতে পারে না—তবে তাকে তা স্পষ্টভাবে বলেই বিতাড়িত করা যায়। অবশ্য তাকে বিদায় দেবার আগেই নায়িকার পক্ষে কর্তব্য হবে আর একজনকে 'অবলম্বন' করা।

বিতাড়ন প্রকাশ্য ভাবে হতে পারে, গুপ্তভাবেও হতে পারে।

প্রকাশ্য উপায়

নায়কের অরুচিকর বিষয়ের সেবা—যেমন নখের দ্বারা তৃণচ্ছেদন, আঙুল মটকানো; এ সব নায়কের সামনে বারবার করতে হবে।

নায়ককে দেখেই নিজের ওষ্ঠ দংশন করে ভয়ের মুদ্রা প্রদর্শন করবে।

ভূমিতে পদাঘাত করবে। অধিক লোকের মধ্যে থাকবে।

গুপ্ত উপায়

যদিই বা সঙ্গমে লিপ্ত হতে ইচ্ছুক হয় তখন কিরূপ আচরণ করবে?

চুম্বন করতে উদ্যত হলে মুখ এগিয়ে দেবে না। জঘন প্রদেশ যাতে আক্রান্ত না হয় সেই চেষ্টা করবে। নখক্ষত ও দন্তক্ষত সহ্য করবে না। আলিঙ্গন করতে এলে বাহু তুলে ব্যবধান সৃষ্টি করবে—সমস্ত দেহ স্তব্ধ করে রাখবে যাতে আকর্ষণ করতে না পারে। নিদ্রালুতার ভাণ করবে। ক্রমাগত বাধা দেওয়ার ফলে যখন দেখবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন বলবে—'কই এস না দেখি!' যদি সমর্থ না হয় তবে উপহাস করে বলবে 'বোঝা গেছে বীরের ক্ষমতা!'

পরিশেষে বক্তব্য এই পরীক্ষার পরে সংযোগ করবে—সংযোগ হলে তার অনুরঞ্জন করবে। অনুরক্ত হলে অর্থ গ্রহণ করবে। তার অর্থ নিঃশেষিত হলে তাকে ত্যাগ করবে। গণিকা তার নায়কের সঙ্গে অতিরিক্ত প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করবে না। এই ভাবে সতর্ক হয়ে চললে প্রচুর অর্থও উপার্জন করতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ত্যাগ ও সন্ধি

বর্তমানে যার অর্থ শোষণ করে নেওয়া হয়েছে, তাকে ত্যাগ করে পূর্বপরিচিত অন্য কোনো ধনবানের সঙ্গে সন্ধি করবে।

অবশ্য সন্ধির পূর্বে তিনটি প্রশ্ন বিচার্য—সে ধনবান কিনা, শুধু ধন থাকলেই হবে না, সে ধন দান করবে, এমন আশা আছে কিনা; আর, সে অনুরক্ত কিনা। অর্থাৎ কেবলমাত্র ধন থাকলেই হবে না, অনুরাগের প্রশ্নটিকে একেবারে বাদ দেওয়া চলবে না।

সে যদি অন্যত্র গিয়ে থাকে তা আগে স্থির করতে হবে অর্থাৎ কোথায় তাকে পাওয়া যাবে, পাওয়া গেলে সে আসবে কিনা—এই সব আগে ভেবে দেখা দরকার।

এই জাতীয় নায়ককে বলে **'বিশীর্ণ নায়ক'**; বিশীর্ণ নায়ক ছয় শ্রেণীর হতে পারে—

১. এখান থেকে নিজেই চলে গেছে এবং সেখান থেকেও নিজেই চলে গেছে।

২. এখান ও সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে চলে গেছে।

৩. এখান থেকে নিজেই চলে গেছে, কিন্তু সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

৪ এখান থেকে নিজেই চলে গেছে, কিন্তু সেখানে এখনও বর্তমান।
৫. এখান থেকে বিতাড়িত হয়ে চলে গেছে কিন্তু সেখান থেকে নিজেই চলে গেছে।
৬. এখান থেকে বিতাড়িত হয়ে চলে গেছে কিন্তু সেখানে এখনও বিরাজমান।

এদের মধ্যে কে সন্ধি স্থাপনের যোগ্য তার আলোচনা প্রয়োজন।

এখান ও সেখান থেকে নিজেই চলে গিয়ে আবার যোগাযোগের চেষ্টা করে অথচ উভয়েরই গুণের কোনো বিচার না করে তবে সেই চঞ্চলবুদ্ধি নায়কের সঙ্গে আর সন্ধি স্থাপন করা উচিত নয়।

এখান ও সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে চলে গেছে, নিজেই চলে যায় নি—এই ক্ষেত্রে মনে হয় নায়ক স্থিরবুদ্ধি। অন্য বহু লাভ-কারিণী নায়িকা যদি তাকে বিতাড়িত করে তবে তার উপর এই নায়কের রোষ উৎপাদন করতে পারলে কার্যসিদ্ধি হতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে এই নায়কের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করা চলে। যদি সারহীন অর্থাৎ নির্ধন ছিল বলে পরিত্যক্ত হয়ে থাকে তবে অবশ্য এই সিদ্ধান্ত ঠিক হবে না।

এখান থেকে নিজেই চলে গেছে কিন্তু সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে চলে গেছে—সে যদি পূর্ব দান অপেক্ষা অধিক ধন দান করে তবে তাকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

এখান থেকে নিজে চলে গিয়ে সেখানে অবস্থান করছে—কিন্তু এখন আবার এখানে আসার চেষ্টা করছে। এস্থলে কিভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে?

এখান থেকে চলে গিয়ে তার কাছে গিয়েছিল—নিশ্চয়ই কোনো গুণের বা লাভের আশায়। কিন্তু সে ব্যাপারে সে বঞ্চিত হয়েছে—

তাই ফিরে আসতে চাইছে। অথবা, এমনও হতে পারে সে এখানকার নায়িকাকে প্রশ্ন করে জানতে চায়—নায়িকা তাকে আবার গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিনা। সেখানে কোনো বিশেষ গুণ দেখতে না পেয়ে; এখানকার নায়িকার মধ্যে সেই বিশেষ গুণ দেখতে পেয়ে এখানকার নায়িকাতে অধিক আসক্ত, হয়তো দানের পরিমাণ বাড়াতে পারে। যদি তাই হয় তবে তার সন্ধান করা সঙ্গত।

এখান থেকে বিতাড়িত হয়ে চলে গেছে; সেখান থেকে নিজেই চলে গেছে; এখন আবার যোগাযোগের চেষ্টা করছে।—এই নায়ক সম্পর্কে তর্ক উঠতে পারে। অবশ্য সে যদি অনুরাগবশতঃ আসতে চায় তবে হয়তো বেশী দান করতে পারে। আর যে নায়ক এখানকার নায়িকার গুণের পক্ষপাতী হয়ে আর অন্য নায়িকায় রতিলাভ করতে পারে না—তার সঙ্গেও সন্ধি করা চলে।

আগে আমি যাকে অন্যায়পূর্বক বিতাড়িত করেছি সে আমার কাছে আবার এসে তার প্রতিশোধ নিতে চায়—যদি সে আমার ধন অপহরণের ইচ্ছা নিয়েই এখানে আসে। সে তো ভৃত্যভাবে থেকেও সেই ধন নিতে ইচ্ছুক হয়ে থাকতে পারে। অথবা এমনও হতে পারে, এখন আমি যার সঙ্গে আছি তার সঙ্গে ভেদ ঘটিয়ে দিয়ে চলে যাওয়াই তার ইচ্ছে। তাই যদি হয়, সে আমার কোনো মঙ্গল কামনা নিয়ে এখানে আসবে না—সুতরাং তার সঙ্গে সন্ধি অবাঞ্ছিত।

যে অস্থিরমতি, এখন অনুরাগ আছে, ধন দান করতে সম্মত কিন্তু পরে আর অনুরাগ থাকবে না, ধনও দেবে না—এরূপ ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করা প্রয়োজন।

যারা অন্যত্র চলে গিয়েছে—পরে নানাভাবে মিলিত হবার চেষ্টা করছে—তাদের কথাও ভেবে দেখা উচিত।

ভেবে দেখতে হবে কেন, তার অনেক কারণ—'দুঃখ দেবার জন্য আমি তাকে বিতাড়িত করেছিলাম—তাই সে অন্যত্র গিয়েছে, কিন্তু

আমার উপর তার অনুরাগ তো কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। যদি ব্যাপা
এমনি হয়ে থাকে তবে তাকে যত্ন করে নিয়ে আসবে।

নায়ক অন্য নায়িকার সঙ্গে মিলিত হবার অপরাধে যদি আ
কিছু বলি এই ভয়ে আমাকে ছেড়ে গিয়ে থাকে—এই অবস্থাতে
নায়ককে সযত্নে ডেকে আনতে হবে।

অথবা এমনও হতে পারে যে আমার লোক এখান থেকে গি
নায়কের সঙ্গে আলাপ করেছে—তবু তাকে কোনো শাস্তি ভো
করতে হয় নি—তাহলে তার খোঁজ খবর করা প্রয়োজন। য
আশঙ্কা হয় যে সম্প্রতি যে নায়িকার কাছে সে আছে তার জন্য
অর্থের অপচয় করবে তবে তাকে সাদরে আমন্ত্রণ করা উচিত
অথবা যদি এমন বুঝা যায় যে তার যেমন আর্থিক অবস্থা তা
নায়ক এলে তার প্রচুর অর্থলাভের সম্ভাবনা—সেই ক্ষেত্রেও তা
সাদর অভ্যর্থনার যেন ত্রুটি না হয়।

আমন্ত্রণ জানানো উচিত কিনা তা স্থির করতে হলে এই বিষয়
গুলি ভেবে দেখা দরকার—

১. সে হয়তো অনেক সম্পত্তি কিনেছে।
২. অর্থব্যয়ের ব্যাপারে তার কর্তৃত্ব রয়েছে।
৩. তার স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছে কিনা, ঘটে থাকলে অর্থব্যয়ে আ
তার কোনো বাধা নেই অর্থাৎ তার পরাধীনতা ঘুচেছে—
খুশিমতো খরচ করতে পারবে।
৪. পৈতৃক সম্পত্তির বিভাগ হয়েছে কি না, অর্থাৎ সে কোনে
অংশের মালিক কি না।
৫. সেই নায়কের সঙ্গে কোনো ধনী ব্যক্তির হৃদ্যতা আছে কিনা
থাকলে তার সাহায্যে সেই ধনী নায়ককে পাওয়া যেতে
পারে।
৬. হয়তো নায়ক খুব চঞ্চল। তা হোক, আমি তো গ্রহণ করে
এর চঞ্চলতা আরও বাড়িয়ে দিতে পারি।

কিন্তু কি ভাবে নায়ককে হস্তগত করা যাবে? নায়িকার দূত গিয়ে তাকে বোঝাবে—'নায়িকা তোমাকে এখনও খুব ভালোবাসে, তবে তার মা খুব রাগী—কি করবে বল, তার মত নিয়েই তো চলতে হয়। তাই তুমি চলে আসার সময় বাধা দিতে পারে নি।' অবশ্য শুধু বোঝালে হবে না, নায়িকার প্রেমের প্রমাণ দিতে হবে, যাতে নায়কের বিশ্বাস জন্মে।

যার সঙ্গে পূর্বে কখনও সম্বন্ধ হয় নি এমন নায়ককে বলা হয় 'অপূর্ব' নায়ক। সহবাসের দ্বারা পূর্বেই যার অনুরাগ ও স্বভাব জানা গেছে তাকে বলে—'পূর্বসংশ্লিষ্ট' নায়ক। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পূর্বসংশ্লিষ্ট নায়কই অধিকতর কাম্য—এ কথা আচার্যগণ বলেছেন। তাঁরা বলেন—পূর্বসংশ্লিষ্ট নায়কের প্রকৃতি, তার অনুরাগ, রুচি সবই জানা। সুতরাং এ জাতীয় নায়কের অনুসন্ধান করাই ভাল! কিন্তু আচার্য বাৎস্যায়ন বলেন—যদি পূর্বসংশ্লিষ্ট নায়ক শোষণ হেতু ধনহীন হয়ে থাকে—তবে সে আর অধিক অর্থ দিতে পারবে না এবং তার বিশ্বাস জন্মাতেও বিশেষ কষ্ট পেতে হবে। এর চেয়ে অপূর্ব নায়কই (যার সঙ্গে পূর্বে কখনও সম্বন্ধ হয় নি) ভাল। সে নিজ থেকেই ভালোবেসে আসতে চাইবে।

আসল কথা, পুরুষ স্বভাব নির্ণয় করা কঠিন। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে সব দেখে শুনে ভালো করে বুঝে নিয়ে সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত। প্রথমে পরিণাম দেখবে, লাভ ক্ষতি বিচার করবে, তারপর হৃদ্যতার কথা বিবেচনা করে যে অগ্রসর হয় সেই গণিকাই বিচক্ষণা।
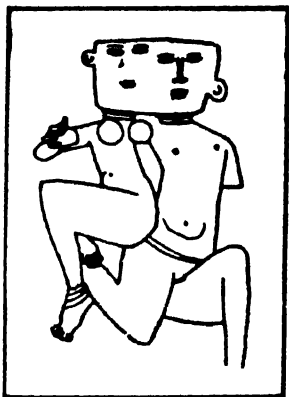
পঞ্চম অধ্যায়

এক

লাভালাভ-বিচার

আচার্যগণ বলেছেন, মিত্রের বাক্য এবং অর্থাগম—এই দুইয়ের মধ্যে যদি বিরোধ না থাকে তবেই যথার্থ অর্থাগম হতে পারে। কাজেই দুটির মধ্যে মিল চাই। অর্থাৎ অর্থাগমের ব্যাপারে মিত্র-বাক্য লঙ্ঘন করা সঙ্গত নয়।

বাৎস্যায়ন বলেন—কথাটা ঠিক নয়, কারণ অর্থাগম পরেও হতে পারে। কিন্তু মিত্র-বাক্য একবার উপেক্ষা করলে মিত্রও তো অসন্তুষ্ট হয়ে উপেক্ষা করতে পারে। সুতরাং মিত্র-বাক্য ও অর্থাগমের মধ্যে মিলন ঘটাবার প্রয়োজন নেই। মিত্র-বাক্যকেই গুরুত্ব দিতে হবে। অবশ্য, গুরুত্ব দিতে গিয়েও বিচার করে দেখতে হবে, যে অর্থ উপেক্ষিত হচ্ছে, পরে সে অর্থ আসবে কি না। যদি আসে, ভালো। না আসলে, পরে আর সেই অর্থাগমের কোনো সম্ভাবনাই নেই।

এখন যে চলে যাচ্ছে সে আর কখনও তার কাছে আসবে না, অর্থও দেবে না। এই চিন্তা করে অর্থাগমের পথটাই তাকে বেছে নিতে হবে—অর্থাৎ অর্থ নিতে হবে; এতে যদি মিত্র-বাক্য উপেক্ষিত হয়—হোক।

মিত্র এতে ক্ষুব্ধ হবে না। কেননা মিত্র জানে, এর পর আর সেখান থেকে অর্থ প্রাপ্তির কোনো আশা নেই। তাছাড়া এই ভাবে তাকে বোঝাতে হবে—একটা বড়ো কাজের কথা উল্লেখ করে বল

হবে, 'আজ আমাকে ক্ষমা করুন; কাল আপনার কথা আমি নিশ্চয়ই রক্ষা করব। যে কাজ হাতে নিয়েছি—সেইটা শেষ হোক, তবে অন্য কথা।'

দুই

বাৎস্যায়ন বলেন, অর্থের পরিমাণ নিতান্ত অল্প—কিন্তু অনর্থের পরিমাণ করা যায় না। তারপর, অনর্থ যদি একবার আসতে শুরু করে তখন বোঝা যায় না, কিভাবে কখন, কোন্ পথে সে আবার এসে পড়বে। কে জানে হয়তো তার আবির্ভাব হবে শিকারকে সমূলে নাশ করবার জন্য। এ সব ভাবলে মনে হবে জীবনে অর্থাগম অপেক্ষা অনর্থপাতের গুরুত্ব অনেক বেশী।

এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন।

বারবণিতা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর—গণিকা, রূপাজীবা ও কুম্ভদাসী। এদের প্রত্যেকটিকেই আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

বারবণিতা কোন্ শ্রেণীর তা বোঝা যাবে তার জীবন যাপনের ধরন দেখে, কখনও বা বাইরের শ্রীসম্পদ দেখে।

কেউ হয়তো দেবমন্দির বা দীঘি প্রতিষ্ঠা করছে, সেতু তৈরি করাচ্ছে কিংবা তার দৌলতেই এখানে ওখানে গড়ে উঠছে পান্থ-নিবাস। সে হয়তো দেবতার পূজা প্রবর্তন করছে, অন্য লোকের মারফৎ ব্রাহ্মণদের দান করছে। এ সকলের ব্যয় যে বহন করতে পারে তাকেই সে আশ্রয় করেছে, তার কাছ থেকে সে অর্থ আদায় করছে।

এক কথায়, পাপপঙ্কে নিমজ্জিত থেকেও সে লোকসেবায় নিজেকে যুক্ত করেছে। একে বলা যায় উত্তমা গণিকা।

রূপোপজীবিনী বারনারীর রুচি স্বতন্ত্র। সে সর্বাঙ্গের জন্য

অলঙ্কার গড়ায়, বাসস্থানের জন্য সুন্দর ও সুদৃশ্য গৃহ নির্মাণ করায়, ইচ্ছামত গৃহের উপকরণ বাড়ায়। এদের মধ্যে যাদের নায়িকাগুণ এবং চারুকলায় রুচি বর্তমান তারা উত্তমা রূপোপজীবিনী।

কুম্ভদাসী আসলে বেশ্যাপতির দাসী বা কুট্টনী। এদের অঙ্গে থাকে শুক্ল বসন—এদের আসক্তি প্রধানতঃ অন্ন ও পানে।

এখন এদের লাভালাভের প্রশ্ন। বাৎস্যায়ন বলেন, দেশ, কাল, সম্পদ, সামর্থ, অনুরাগ ও লোকপ্রবৃত্তি অনুযায়ী লাভ কখনও কম হতে পারে, কখনও বেশী হতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে অল্পমাত্র লাভেও কাজে নামতে হয়—তখন লাভ-ক্ষতির কথা ভাবলে চলে না। ধরা যাক, ঈপ্সিত নায়ককে অন্য নায়িকার নিকট যেতে দেওয়া হবে না কিংবা অন্য নায়িকাতে আসক্ত নায়ককে অপহরণ করে নিয়ে আসতে হবে; এমন অবস্থাও হতে পারে যে অন্য নায়িকাকে অধিক লাভ থেকে বঞ্চিত করতে হবে কিংবা ঈপ্সিত নায়কের সংসর্গে নিজের বুদ্ধি ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, আর কিছু না হোক, কোনো অনর্থ হয়তো ঘটেছে, তার প্রতিকার করতে হবে—এ সব ক্ষেত্রে লাভের কথাটা বড় নয়, কল্যাণবুদ্ধিসম্পন্ন ঈপ্সিত যে নায়ক, তার কাছে অল্প লাভে বা বিনা লাভেই আত্মসমর্পণ করতে হবে। মনকে সান্ত্বনা দিতে হবে—'টাকাটাই কি সব? তার প্রীতি পেয়েছি, এতেই তো আমি ধন্য।'

কিন্তু লাভের আশা অন্যত্র করা যেতে পারে। কোনো নায়ক হয়তো নিজেই নিজের প্রভু—অর্থাৎ নিজের খুশিমতো খরচ করতে পারে; নায়কের আর একটি গুণ, কথা দিলে সে কথা রাখে। যদি বুঝা যায় এই নায়কের নূতন কোনো আধিপত্য লাভের সময় উপস্থিত হয়েছে—তবে এর কাছে ভবিষ্যতে লাভের আশা করা যায় বই কি। একটু কৌশলে মুখের কথাটি আদায় করে নিতে পারলেই হল। এর জন্য, প্রয়োজন হলে, এর সঙ্গে স্ত্রীর মত আচরণ করবে।

যার কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে কষ্ট পেতে হয়, যে

হৃদয়হীন—বর্তমানে তার কাছে কিছু 'প্রাপ্তি' নেই বলে তাকে ত্যাগ করবে, ভবিষ্যতেও কিছু পাবার চেষ্টা করবে না। কিন্তু যাকে ত্যাগ করলেই অনর্থের আশঙ্কা, আর সঙ্গমে মঙ্গলের সম্ভাবনা তাকে কোনো ছলে সযত্নে ঘরে ডেকে এনে তার সঙ্গে মিলিত হবে।

সামান্য উপকারে প্রসন্ন হয়ে প্রচুর টাকা ঢেলে দেয় এমন লোকের অভাব নেই। গণিকা সম্পর্কে এদের প্রচণ্ড উৎসাহ। প্রয়োজন হলে নিজের ধন ব্যয় করেও এই জাতীয় লোক সংগ্রহ করবে। এরা প্রচুর দান করতে পারে এই আশায় এদের তুচ্ছ দেহ-দান করতে দোষ নেই।
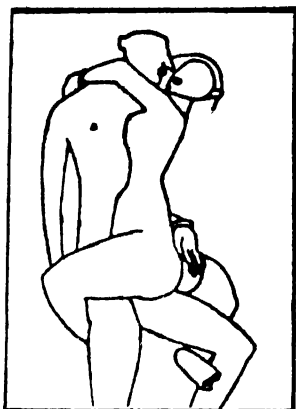
ষষ্ঠ অধ্যায়

এক

পরিণাম—সংশয় বিচার

গণিকার বিবাহিত জীবন সমাজে নিষিদ্ধ; তাছাড়া অর্থ উপার্জন করতে থাকলে কিন্তু পরিণামে অনর্থ দেখা দেয়, আনুষঙ্গিক দোষেরও উদ্ভব হয়, নানা রকম সংশয় সৃষ্টি হয়ে থাকে।

নানা কারণেই এই অনর্থ, আনুষঙ্গিক দোষ বা সংশয়ের সৃষ্টি হতে পারে। কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে—

১. বুদ্ধির দুর্বলতা ২. অতিরিক্ত অনুরাগ ৩. অতিরিক্ত অভিমান ৪. অতিরিক্ত দম্ভ ৫. অত্যধিক সরলতা ৬. অত্যধিক বিশ্বাস ৭. অসংযত ক্রোধ ৮. অসতর্কতা ৯. অবিমৃষ্যকারিতা (চিন্তা না করিয়া কাজ করা) এবং ১০. দৈবযোগ।

উল্লিখিত কারণগুলি যদি থাকে তবে যে সব অবাঞ্ছিত ফল দেখা দিতে পারে তাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য—১ সঞ্চিত ধনের অপচয় অর্থাৎ ব্যয়ের নিষ্ফলতা, ২ প্রভাবহানি, ৩. পরিচয়ের ক্ষতি ৪. অর্থঘটিত আশার ব্যর্থতা এবং ৫. দেহের ক্ষতি।

সুতরাং এই সকল কারণ যাতে উপস্থিত না হয়, গোড়া থেকেই সেই সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। কারণকে বাধা দিতে গিয়ে যদি অর্থলাভের আশা ত্যাগ করতে হয়, তবুও তা কর্তব্য।

অর্থ, ধর্ম ও কাম—এই তিনটি হল অর্থ-ত্রিবর্গ; অনর্থ, অধর্ম ও

দ্বেষ—এই তিনটিকে বলা হয় অনর্থ-ত্রিবর্গ। অনর্থ-ত্রিবর্গ অর্থ-ত্রিবর্গের বিপরীত।

যে উত্তম নায়কের সঙ্গে মিলিত হলে প্রত্যক্ষভাবে অর্থলাভ হয়, গৌরব বৃদ্ধি হয় এবং নায়কের নিকট প্রার্থনীয় হওয়া যায়—সেই নায়কই বরণীয়। এইরূপ নায়কের মিলনে যে অর্থলাভ হয় তা-ই গ্রহণীয়। কেবলমাত্র তৎকালীন লাভের জন্য যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে মিলন সর্বথা বর্জনীয়।

এমনও হতে পারে কোনো বিত্তহীন ব্যক্তি কামনাতৃপ্তির মোহে অন্যের ধন আত্মসাৎ করে এনে গণিকাকে দিয়েছে—তাহলে সেই অর্থ গ্রহণ করলে গণিকার কি না ক্ষতি হতে পারে। প্রভাবহানি তো আছেই, পূর্বসঞ্চিত অর্থের বিনাশ এবং সেই সঙ্গে তার ভবিষ্যৎও বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠতে পারে। শুধু অর্থার্জন উদ্দেশ্য নয়, কে সেই অর্থ দিচ্ছে তার বিবেচনা গণিকাকেই করতে হবে। অর্থ দিচ্ছে বলে কি কোনো ঘৃণিত নীচ জাতীয় ব্যক্তি নায়িকার শয্যাসঙ্গী হতে পারে? এতে প্রভাবহানি হবে কিনা নায়িকাকে কি তা ভেবে দেখতে হবে না? নায়ক রুগ্ন কিনা সে প্রশ্নটির মীমাংসা তো নায়িকাকে প্রথমেই করে নিতে হবে।

আসল কথা এই দেহ-দানের পূর্বে নায়িকাকে ভেবে দেখতে হবে লোকটি বিত্তবান এবং প্রভাবশালী কিনা; সে লুব্ধ হলেও ক্ষতি নেই—কেননা এই প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সে নিজের অনর্থ প্রতিকারের জন্য কাজে লাগাতে পারবে। এ সব ক্ষেত্রে হয়তো অবস্থা-বিশেষে নায়িকার নিজের কিছু অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে—কিন্তু পরিণামের কথা ভেবে সেই ব্যয়ও সার্থক। তবে সেই প্রভাবশালী ব্যক্তি যদি হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর হয় তবে তার আরাধনা করে লাভ নেই।

অর্থের ক্ষেত্রে যেমন আনুষঙ্গিক শুভাশুভের কথা ভাবতে হবে, ধর্ম ও কামের ক্ষেত্রেও তাই। এখন **সংশয়** সম্পর্কে আলোচনা—

ফলপ্রাপ্তি সন্দিগ্ধ হলে—হবে কিনা এই সন্দেহকে বলে **শুদ্ধ সংশয়**।

ফলপ্রাপ্তিতে সন্দেহ না থাকলেও, ধর্ম হবে কি অধর্ম হবে এই রকম সন্দেহকে বলে **সঙ্কীর্ণ সংশয়**।

শুদ্ধ সংশয়—বিবিধ কামোপচারে পরিতোষিত হলেও নায়ক অর্থ দেবে কিনা—এই সংশয়। দেহদান গণিকার ধর্ম; কোনো কামুককে দেহদান করে গণিকা অর্থ লাভ করতে পারে নি—এখন পীড়নপূর্বক অর্থ আদায় করে—বর্জন করা ধর্ম না অধর্ম—এই সংশয়।

অথবা গণিকারই সুন্দর এক ক্ষুদ্র পরিচারক—নায়ক রূপে সে গণিকার অভিপ্রেত; তার সঙ্গেই গণিকার সঙ্গম সুসম্পূর্ণ হয়েছে—কিন্তু তার কাছে এটি অভিপ্রেত ছিল না, হয়তো তার কামবোধই জাগে নি। এই অবস্থায় গণিকার দেহসঙ্গমকে কামচারণ বলা হবে কি না—এই সংশয়। কিংবা সঙ্গমোৎসুক কোনো ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে গণিকা প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রত্যাখ্যাত নায়ক ক্ষুদ্র হলেও প্রভাবশালী—সে রাজকুলে গিয়ে সব কথা নিবেদন করে অনর্থ সৃষ্টি করবে কিনা—এই সংশয়।

সঙ্কীর্ণ সংশয়—এটি হবে না এটি হবে যেখানে এইরূপ সংশয় সেখানেই সঙ্কীর্ণ সংশয়।

কোনো এক আগন্তুক এসেছে। কিন্তু সেই অজ্ঞাতকুলশীল কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির আশ্রিত না প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজেই উপস্থিত? এখন তার আরাধনা করা অর্থকর না অনর্থকর? এই সংশয়। শ্রোত্রিয়, ব্রতী, ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী আমাকে দেখে কামাতুর হয়েছে—এ কি ধর্মের জন্য না অধর্মকর? এই সংশয়। এ ব্যক্তি গুণবান কিনা তা নিজে না দেখে, কেবল অনিশ্চিত জনশ্রুতির

উপর নির্ভর করে 'গুণবান' মনে করে সঙ্গত হলে কি কামলাভ হবে, না দ্বেষ উৎপাদন করা হবে? এই সংশয়।

সকল গণিকারই অনুরূপ নায়ক, সহায়, তাদের অনুরঞ্জন, অর্থাগমের উপায়, বিতাড়ন এবং পুনঃ সন্ধান, লাভালাভ বিচার, অর্থ ও অনর্থের বিচার এবং সংশয় বিচার প্রভৃতি আছে।
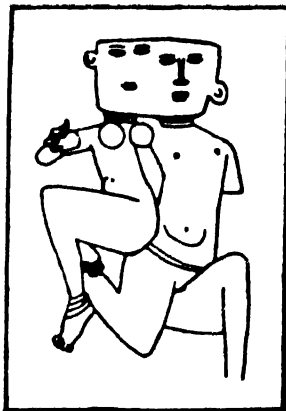
পঞ্চম পর্ব

পরনারী

প্রথম অধ্যায়

শীল বিচার

সুখ ও সন্তান ছাড়া পরনারী গমন যে যে কারণে কর্তব্য তা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পরনারী সঙ্গমের পূর্বে এই কয়টি পরীক্ষা করে দেখবে—১ সাধনের যোগ্য কিনা ২ নিরাপদ কিনা ৩. ভবিষ্যতে সেটি কল্যাণপ্রদ কিনা ৪. এই সঙ্গমের দ্বারা আত্মরক্ষা সম্ভব কিনা।

পরস্ত্রীগমনের প্রধান কারণ আত্মরক্ষা। যদি বুঝা যায়, এর দ্বারা আত্মরক্ষা সম্ভব, তবে আর দ্বিধা করবে না। যখন কোনো একটি স্ত্রীকে দেখে কামভাব জাগবে, তখন লক্ষ্য করে দেখবে, সেই কামভাব ক্রমেই একটি অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে তখন বুঝবে, নিজের দেহকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষার জন্যই পরনারীতে সঙ্গত হওয়া দরকার। শাস্ত্রে বলা হয়েছে কামের দশ অবস্থা। কি কি?

পরস্ত্রী দর্শনের পর প্রথম জাগবে **সংযোগেচ্ছা**—এই ভাবে কামোদয়ের পর নায়কের দুই চোখে স্নিগ্ধভাব দেখা দেবে। তারপর ভোগ্য বিষয় না পাওয়াতে মনে মনে আসক্তির সৃষ্টি হবে—এর নাম **মনঃসঙ্গ**; তখন একটি মাত্র চিন্তা—'কি করে পাব? যদি পাই, তবে এই ভাবে করব।' এই অবস্থাকে বলে **সঙ্কল্পোৎপত্তি**; সঙ্কল্প যখন গাঢ় হতে থাকে তখন **নিদ্রাচ্ছেদ** অর্থাৎ নিদ্রায় ব্যাঘাত;

ফলে দেহ কৃশ হয়—শাস্ত্রে একে বলা হয় **তনুতা** ; দেহ যখন দিনের পর দিন কৃশ হতে থাকে তখন বিষয়-ব্যবহার আর কিছুই ভালো লাগে না—সুতরাং **'বিষয় ব্যাবৃত্তি'** হয় ; অর্থাৎ সর্বদা তন্ময়চিত্তে নারী ধ্যান করতে করতে অন্য যে কোনো বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মে। বিষয় ব্যাবৃত্তি থেকে **লজ্জাপ্রণাশ** অর্থাৎ লজ্জা বিসর্জন ; এই সময়ে পরনারী প্রেমিক নির্লজ্জ হয়ে পড়ে—তখন আর গুরুজনের ভয় থাকে না। লজ্জা ও ভয় না থাকায় দেখা দেয় **উন্মাদ** দশা—উন্মাদ দশা থেকে **মূর্চ্ছা**—মূর্চ্ছা থেকে **মরণ** অর্থাৎ প্রাণত্যাগ।

আচার্যগণ বলে থাকেন, অনুরাগের ব্যাপারে যুবতীর সঙ্গমেচ্ছা জেগেছে কিনা জানা যাবে সেই যুবতীর শীল, সত্যবাদিতা, চরিত্র শুদ্ধি এবং চণ্ডবেগের দ্বারা।

কার কি শীল ? বর্ণ ও বেশের দ্বারা উজ্জ্বল যে কোনো স্বকীয় বা পরকীয় পুরুষ দেখে স্ত্রী কামনা করে ; তেমনি আবার স্ত্রীকে দেখে পুরুষও কামনা করে। তবে স্ত্রীলোকের কামনায় কিছু বিশেষত্ব আছে। স্ত্রীর কামভাব জাগলে ধর্ম ও অধর্মের অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু পুরুষ রাখে। স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে ইচ্ছুক হয়েও কতকগুলি কারণে তাকে নিবৃত্ত হতে হয়।

কি কি কারণে স্ত্রী সঙ্গম থেকে নিবৃত্ত হয় ? —স্বামীতে অনুরাগ ; স্তন্যপায়ী শিশুর অপেক্ষা ; বয়সের অতিক্রম ; দুঃখের বোধ এবং বিরহ বোধের অভাব ; সত্বরই চলে যাবে— ভবিষ্যতের কোনো আশা করা যায় না ; সেই সময়ে অন্য বিষয়ে মনের আসক্তি থাকা ; অসংবৃত হয়ে লোকের নিকট আমার গান গেয়ে বেড়াবে এই জন্য উদ্বেগ ; মিত্রবর্গের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা ; স্বামী তেজস্বী, জানতে পারলে ভীষণ অনর্থ বাধাবে এই জন্য ভয় ; এ ব্যক্তি নির্বোধ—দেশ বা কাল বুঝে না—এজন্য নায়কের গুণ থাকলেও দোষ দর্শন ; নীচজাতীয় নায়কের সহবাসে সখীদের নিকট গৌরবের হানি ; 'আমার জন্য এর দৈহিক বা আর্থিক ক্ষতি না

হয়'—এই ভেবে অনুকম্পা; স্ত্রী পতিব্রতা কিনা তা পরীক্ষার জন্য এই ব্যক্তি বোধ হয় পতি কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছে—এই সন্দেহ; ধর্মভীরুতা।

এই সব কারণের মধ্যে যে কারণ নিজের মধ্যে লক্ষ্য করবে তা সকলের আগে বর্জন করবে। যাতে স্ত্রীর অনুরাগ বৃদ্ধি হয় সেই চেষ্টা করবে—অনুরাগ বৃদ্ধি হলে উল্লিখিত অনেক কারণ ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হবে। আশঙ্কা, সন্দেহ, উদ্বেগ, ভয় প্রভৃতি ক্রমপরিচয়ের মাধ্যমে আশ্বাসের সাহায্যে দূর করতে চেষ্টা করবে।

অবশ্য নারীর 'শীল' সম্পর্কে পরিপুষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। এই শীল সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। শীল অর্থ স্বভাব বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। যেমন উজ্জ্বল বেশধারী সুন্দর পরপুরুষ দর্শনে নারী চঞ্চল হয়—এটি তার 'শীল'; একবার ভোগে অতৃপ্তি বার বার ভোগের কামনা—এটি তার শীল; তাকে যে নানা কারণে ভোগ থেকে নিবৃত্ত হতে হয়—এটি তার শীল। পুরুষ যে সুলভা স্ত্রীকে অবজ্ঞা করে, দুর্লভাকে কামনা করে—এটি পুরুষের শীল।

নারী ও পুরুষ যদি পরস্পরের শীল সম্পর্কে সচেতন না থাকে তবে মিলনের আশা নেই। যে পুরুষ নারীর শীল সম্পর্কে অভিজ্ঞ; সঙ্গমে তার সিদ্ধি অনিবার্য। নারী জানে কারা এই 'সিদ্ধ' পুরুষ।

যে সব পুরুষ নারীদের কাছে 'সিদ্ধ' বলে পরিচিত তাদের একটি ক্ষুদ্র তালিকা এখানে দেওয়া হল—

১. কামসূত্র যার নখদর্পণে—অর্থাৎ যিনি কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞ।
২. যিনি কথাখ্যানে কুশল অর্থাৎ যিনি বাক্‌পটু।
৩. যিনি উত্তমা স্ত্রী কর্তৃক প্রার্থিত। এমন সৌভাগ্যবান পুরুষ নিশ্চয়ই কেউ কেউ আছে যাকে শ্রেষ্ঠা নারীগণ কামনা করেন।
৪. খ্যাতিমান পুরুষ; উদ্যানক্রীড়াশীল পুরুষ, নটাদি দর্শনশীল পুরুষ—যদি এরা কামশীল হন।

৫. বৃষরূপে যিনি সিদ্ধ প্রতাপ, এমন কি লম্পট বলেও যিনি লব্ধ প্রতাপ।

৬. যিনি সাহসী এবং বিদ্যা, রূপ ও গুণে ভূষিত।

সুতরাং পরনারী সঙ্গমের পূর্বে নিজের সিদ্ধি আছে কি না তার বিচার প্রয়োজন।

যে সকল নারী অযত্নসাধ্যা অর্থাৎ কামোপভোগের ব্যাপারে যারা অনায়াসে লভ্যা—তাদের কথাও এখানে আলোচিত হল। নারীদের মধ্যে কারা অনায়াসলভ্যা ? তাদের ভাবভঙ্গী কিরূপ ?

১. যিনি দ্বারদেশে অপেক্ষা করেন।

২. যিনি পুরুষ দর্শনের জন্য প্রাসাদের ছাদে উঠে গিয়ে রাজপথের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

৩ নায়ক কর্তৃক দীক্ষিতা হয়ে যে নারী, আর কেউ দেখতে পেয়েছে কি না এই ভেবে দুই পাশে তাকায়।

৪. যে নারী স্বামী গুণবান হলেও তার সহবাস কামনা করে না।

৫. যে সন্তানহীনা।

৬. যে সর্বদা জ্ঞাতিগৃহে বাস করে।

৭. বালবিধবা ; জ্যেষ্ঠা ভার্যার যদি বহু দেবর থাকে ; নট-নর্তকাদির ভার্যা।

৮. যে নারী নিজেকে গৌরবান্বিতা মনে করে, কলাভিজ্ঞা বিদুষী মনে করে আর স্বামীকে মনে করে গৌরবহীন।

৯. যে নারীর স্বামী ও প্রার্থী তুলগুণবিশিষ্ট ; কিন্তু প্রার্থী বিশেষ প্রলোভন দেখাচ্ছে—' এবং নারীও লোভের বশীভূতা)।

১০. যে নারী কন্যা কালে নায়ক কর্তৃক সযত্নে আরাধিতা হয়েছিল, কিন্তু কোনো কারণে এখন সে অন্যের বিবাহিতা। স্বামী ও প্রণয়ী—উভয়েরই বুদ্ধি, মেধা,

অর্থ ও প্রতিপত্তি সমান—এ অবস্থায় অল্প আয়াসেই সে প্রণয়ীর অঙ্কশায়িনী হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১১. বিনা অপরাধে যে নারী স্বামীর নিকট অবমানিতা, যে নারীর স্বামী অকারণে স্ত্রীকে ঈর্ষা করে, যে নারীর পতি চিরপ্রবাসী।

১২. যার স্বামী নপুংসক, কাপুরুষ, চিররুগ্ন, রোগদুষ্ট, কুব্জ, বামন অথবা বিরূপাকৃতি।

১৩. যে নারীর স্বামী বৃদ্ধ।

এ সকল নারী সামান্য চেষ্টাতেই নায়কের অঙ্কশায়িনী হতে পারে। সুতরাং এরা অযত্নসাধ্যা।

আগেই বলা হয়েছে, কোনো উজ্জ্বল পুরুষ দেখলেই রমণীর ইচ্ছা জেগে ওঠে। কিন্তু ইচ্ছা এখানে বড় কথা নয়। সেই ইচ্ছাকে অনুরাগ ও বিভিন্ন ক্রিয়ার সাহায্যে বাড়াতে হবে—সেই বর্ধিত ইচ্ছাকে আবার প্রজ্ঞা দ্বারা শোধন করে নিতে হবে। নারীর দিক থেকে যে সব বাধা আছে তা দূর করতে হবে—সঙ্গে সঙ্গে বিচার করে দেখতে হবে—'আমি এর পক্ষে সিদ্ধ কি না।' শনৈঃ পন্থাঃ—এ ব্যাপারে দ্রুততার স্থান নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিচয় বিধি

ইচ্ছা যখন জাগবে তখন তাকে বিভিন্ন ক্রিয়ার সাহায্যে বাড়িয়ে তুলতে হয়—এ কথা আগে বলা হয়েছে। সেই সব ক্রিয়া কি কি, এই অধ্যায়ে থাকবে তারই আলোচনা।

প্রথমে প্রয়োজন—নায়িকার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন। পরিচয় দু'রকমের—স্বাভাবিক ও চেষ্টাসাধ্য।

স্বাভাবিক দর্শন ঘটতে পারে যদি নায়িকা কখনও নিজের বাড়ির কাছে আসে। এ ছাড়া স্বাভাবিক দর্শন আর কি করে ঘটবে? জ্ঞাতি বা বন্ধুর বাড়িতে কোনো বিবাহ, যজ্ঞ বা উৎসব উপলক্ষ্য এলেও দর্শন হতে পারে তবে সে দর্শন চেষ্টাসাধ্য।

নায়িকাকে দেখতে পেলে সকল সময়ে তার মুখ ও চোখের ভাব লক্ষ্য করবে। কোনো বন্ধুর কাছে নায়িকা সম্পর্কিত কথা বলতে থাকবে,—এমন ভাবে বলবে যাতে নায়িকা শুনতে পায়। নায়িকাকে ছলে নিজের কথা বোঝাতে হবে। কোনো বন্ধুর ক্রোড়ে শায়িত বা উপবিষ্ট থেকে মনের ভাব প্রকাশ করে যাবে—বেশ ভাবালু কণ্ঠে বলবে—এমন সব কথা বলবে যা অন্য কোনো বন্ধুকেও বলা যায়। এই ভাবেই সুকৌশলে মনের ভাব ব্যক্ত করবে—

'জানি না, আমার কামনা সফল হবে কি না হবে। আচ্ছা, একবার বিশ্বাস করেই দেখ না, আমি তো আর অপাত্র নই!' যেন বন্ধুকেই বলছ তোমার মনের কথা—সেইভাবে সুকৌশলে গোপন ভাবগুলি অকপটে ব্যক্ত করে যাবে। তোমার বন্ধুকেই বলবে—'আমি তোমাকে কত ভালোবাসি, তা তুমি জানো না। আমার দুঃখ, এত ভালোবাসা দিয়েও তোমার মন পাই না!'

বলার সঙ্গে সঙ্গে কটাক্ষপাতে লক্ষ্য করবে—নায়িকার মুখে চোখে কোনো ভাবান্তর হয় কিনা।

অবস্থা অনুকূল মনে হলে নায়িকাকে উদ্দেশ্য করে নিকটস্থ কোনো বালককে ধরে চুম্বন বা আলিঙ্গন করতে পারো। কিংবা তার নরম চিবুক ধরে আদর করে দিতে পারো।

কি করবে তা সবিশেষ বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এই সব ক্রিয়া পদ্ধতি নির্ভর করবে অবকাশ বা সুযোগের উপর, নায়িকা কিভাবে গ্রহণ করছে তার উপর, সবার উপর নায়কের ব্যক্তিগত রুচির উপর।

নায়িকার কোলে যদি কোনো শিশু থাকে তাকে একটু বেশি মাত্রায় আদর করে দেওয়া যেতে পারে। নানা রকম দ্রব্য উপহার দিলেও কাজ হবে। শিশু অবোধ, যা-কিছু একটা পেলেই সে খুশি; কিন্তু যিনি বোধসম্পন্না তিনিও খুশি হবেন। শিশুকেই খেলনা, গন্ধদ্রব্য, ফুল - এ সব উপহার দেওয়া হচ্ছে। সব সময়ে যে শিশুই হাত বাড়িয়ে নেবে এমন নয়—মাঝে মাঝে নায়িকাও দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করতে পারে, সেই অবকাশে নিজের হাতের বহুমূল্য আঙটিটি নায়িকার হাতে গুঁজে দিলে ক্ষতি কি?

শিশুকে আদর করার অবকাশে নায়িকার সান্নিধ্যলাভ সহজ; তার সঙ্গে কথাবার্তার বিভিন্ন উপলক্ষ্য সৃষ্টিও সম্ভব। উপলক্ষ্য মানে কোনো কাজের ছল; সেই ছলেই মাঝে মাঝে যাতায়াত খুবই স্বাভাবিক।

প্রথম অবস্থায় নায়িকা হয় তো কথা বলবে না—কিন্তু নায়কের সঙ্গে কথা বলবে এমন কেউ না কেউ থাকবেই—তাকে আশ্রয় করেই ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য।

এই ভাবে আস্থা যখন স্থাপিত হবে, আলাপ-পরিচয় যখন ঘনীভূত হবে—তখন নির্জন প্রদেশে অবকাশমত চুম্বন, আলিঙ্গন ও দেহ-মর্ষণ ইত্যাদি চলতে পারে। এ নাটকের শেষ দৃশ্যে নায়িকা-সঙ্গম—সেই দৃশ্য কোথায় কি ভাবে অভিনীত হবে তা স্থির করবেন নায়ক ও নায়িকা।

একটি কথা মনে রাখা দরকার। যে গৃহে নায়িকার স্বামী অন্য স্ত্রীতে আসক্ত—সে গৃহে নায়িকা সুলভ হলেও হাত বাড়াবে না। তাছাড়া যে নায়িকার শ্বশ্রু আছেন এবং পুত্রবধূকে সর্বদা চোখের উপরে রাখেন—সেই গৃহও বর্জন করা সঙ্গত। আসল কথা, অগ্রসর হবার আগে নায়ককে ভেবে দেখতে হবে—'এই ব্যাপারে আমি কৃতকার্য হব কিনা।'

তৃতীয় অধ্যায়

ভাব পরীক্ষা

পরস্ত্রীরমণ সম্পর্কে আর এক কথাও চিন্তনীয়। যে পরনারী অন্য পুরুষের সঙ্গে সঙ্গমে স্বীকৃত হয়েছে, সে প্রগল্‌ভা সন্দেহ নেই। দেখা গেছে, এ জাতীয় নারী সম্পর্কে যেন কিছুতেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না; সুতরাং ভাব পরীক্ষার প্রয়োজন।

প্রত্যেক বার রমণের শেষে নায়ক নায়িকার ভাব পরীক্ষা করবে।

দেখা গেল সঙ্গমে লিপ্ত থেকেও নায়িকা একদিন সঙ্গম প্রত্যাখ্যান করেছে—কিন্তু একেবারে বর্জন করে নি, আবার কিছু দিন পরেই আবার নায়কের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আবার কেউ কেউ আছে—তারা সঙ্গম সহ্য করে যায়; স্বভাবতঃই এর মূলে থাকে এদের চরিত্রগত সহিষ্ণুতা। কিন্তু দেখা গেল, আত্মসমর্পণ করতে সে কুণ্ঠিত।

সঙ্গত হয়েও নায়িকা সঙ্গম প্রত্যাখ্যান করে—সঙ্গমে উদাসীন হয়ে পড়ে, কিন্তু নায়ককে একেবারে প্রত্যাখ্যানও করে না। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ নিজের মনে কোনো প্রবলতর গৌরবের অভিমান থাকে।

সঙ্গমের সূচনায় যদি নায়িকা অত্যন্ত নিষ্ঠুর বাক্যে তিরস্কার করে প্রত্যাখ্যান করে তবে তাকে উপেক্ষা করবে; অবশ্য কর্কশ

বাক্য প্রয়োগের পর যদি সে প্রীতি স্থাপন করতে ইচ্ছুক হয়—তবে সঙ্গমের চেষ্টা করবে।

কোনো নায়িকা হয়তো নায়কের অভিপ্রায় জানে না—সে 'স্পর্শন' সহ্য করে; কিন্তু 'স্পর্শন' যে সঙ্গম থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয় এ কথা সে বোঝে না বা বুঝতে চায় না। যাই হোক, এ নায়িকা দ্বিধাগ্রস্তা; তাকে বোঝাতে হবে, স্পর্শন, মর্ষণ ও ধর্ষণ—এ সব একই প্রক্রিয়ার স্তরভেদ মাত্র।

এবার হস্তন্যাস ও পাদন্যাসের কথা।

নায়িকা যদি কাছেই শুয়ে থাকে তবে নায়ক যেন ঘুমের মধ্যে করছে এমন ভাণ করে নিজের হাত নায়িকার দেহের উপর রাখবে। যদি নায়িকা ঘুমিয়ে থাকে, সে ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করবে; যদি জেগে থাকে তবে সে হাতখানি সরিয়ে দেবে।

কেননা, তার মনে সন্দেহ হতে পারে—নায়ক কি সঙ্গমের কামনাতেই ঘুমের ভাণ করে হাত রেখেছে না ঘুমিয়েই হাত রেখেছে? সেই সন্দেহ দূর করবার জন্যই—সঙ্গমার্থিণী হয়েই সে হাত সরিয়ে দেবে। তার মনের ভাবটি এই—দেখা যাক্, যদি রমণ চায়, আবার নিশ্চয়ই হাত রাখবে।

নায়ক অতঃপর নিশ্চয়ই তার সন্দেহ দূর করবে।

এই ভাবে পাদন্যাস করেও ভাব পরীক্ষা করা যেতে পারে। দেহের উপর হাত রাখা এবং পায়ের উপর পা রাখা—এই দুটিকেই যদি নায়িকা সহ্য করে যায় তবে ঘুমের ভাণ করেই তাকে আলিঙ্গনের চেষ্টা করবে। যদি সে আলিঙ্গন সহ্য না করে উঠে চলে যায়—তবু বিচলিত হবার দরকার নেই। লক্ষ্য রাখতে হবে পরদিন সে কোনো কোপ প্রকাশ করে কি না অর্থাৎ সে প্রকৃতিস্থ আছে কিনা।

যদি প্রকৃতিস্থ থাকে তবে জানবে সে সঙ্গমার্থিণী। কিন্তু যদি পরদিন প্রকৃতিস্থা থেকেও, নায়কের কাছে তারপর থেকে দুর্লভ

হয়ে ওঠে তবে নায়িকার পরিচিত দূতীরূপে পাঠাতে হবে।

সঙ্গতা না হয়েও নায়িকা সঙ্গমেচ্ছা-সূচক ভাব প্রকাশ করতে পারে। দেখা গেল—'সহসা শিথিলবেশা' তাতে কোনো কোনো অঙ্গ অনাবৃত হয়ে পড়েছে। অবশ্য এর জন্য বিজন পরিবেশ দরকার।

সঙ্গমাভিলাষিণীর বাক্‌পদ্ধতি পৃথক। কণ্ঠস্বর কম্পিত, ভাষা স্তিমিত কিন্তু গম্ভীর। যে নারী সামান্য একটু ডাকলেই বেশ পরিস্ফুট ভাবে উত্তর দেয়, বুঝতে হবে তার রতি-লালসা অধিক। এই নারী সহজসাধ্যা।

প্রথমে পরিচয়, তারপর পরিভাষণ। প্রথম দর্শনেই যে নারী আকারে, ইঙ্গিতে মনের ভাব ব্যক্ত করবে অবিলম্বেই তার সঙ্গম লালসা তৃপ্ত করা উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়

দূতীকর্ম
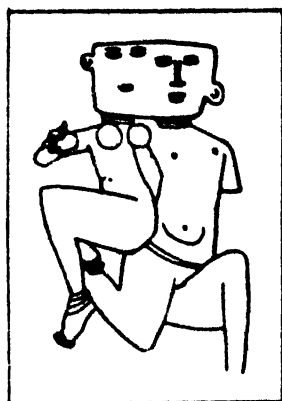
কখনও কখনও দূতীর সাহায্য নায়কের পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কখন ?

ধরা যাক, নায়িকাকে আকারে-ইঙ্গিতে মনের কথা নিবেদন করা হয়েছে কিন্তু তার দিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না ; এমন কি তার দর্শনও দুর্লভ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, এমনও হতে পারে, নায়িকা নিজে কোনো ইঙ্গিত করে নি—এ রকম ক্ষেত্রে দূতীকে স্মরণ করতে হবে।

দূতী তিন শ্রেণীর হতে পারে। যে দূতী নায়ক বা নায়িকার অভিপ্রায় বুঝে নিজের বুদ্ধির সাহায্যেই নানা রকম কৌশল অবলম্বন করে কার্যসিদ্ধি করতে পারে সে প্রথম শ্রেণীর—তাকে বলা হয় 'নিস্পৃষ্টার্থা' অর্থাৎ যে নিজে থেকেই প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য কৌশল সৃষ্টি করতে পারে।

যে দূতী নায়ক বা নায়িকা যা বলে দেয় শুধু তা-ই বহন করে নিয়ে যায় এবং প্রয়োগের ব্যাপারে চাতুরীর পরিচয় দেয়—তাকে বলা হয় 'পরিমিতার্থা'। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দূতীর সব কিছুই পরিমিত—উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের উপায় সম্পর্কে এদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ—সেই নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই এদের বিচরণ।

তৃতীয় শ্রেণীর দূতীকে বলা হয়েছে 'পত্রহরী'। এরা পত্রহারিণী অর্থাৎ পত্রবাহিকা। কেবলমাত্র নায়ক বা নায়িকার পত্র বহন করে নিয়ে যথাযোগ্য স্থানে পৌঁছে দেওয়াই এদের কাজ।

বলা বাহুল্য, প্রয়োজন বুঝেই দূতী নির্বাচন করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর দূতীকে নিয়োগ করতে পারলে স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা। কিন্তু সেই দূতীর করণীয় কি?

বেশ ভদ্রবেশেই সে প্রবেশ করবে নায়িকার গৃহে। তার কথাবার্তায়, চালচলনে, ভাবে ইঙ্গিতে—সব কিছুতেই থাকবে একটি শোভনতার ছাপ। তার প্রথম ও প্রধান কাজ হবে নায়িকার বিশ্বাস উৎপাদন করা।

সে প্রথমেই নায়িকাকে কিছু সুন্দর ছবি দেখাবে—যাদের ছবি তাদের সম্পর্কে মনোজ্ঞ কাহিনী শোনাবে। তাছাড়া কথায় কথায় পুরাণ প্রসঙ্গ আনবে—নানারকম পুরাণের কথা বলে যাবে—এমন সব কাহিনী যাতে নায়ক-নায়িকার কাম-প্রবৃত্তির কথা থাকে।

শুধু পুরাণ কাহিনী শোনালেই চলবে না, সেই সঙ্গে চলবে নায়িকার রূপ ও গুণের প্রশংসা—প্রশংসা মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে। উদ্দেশ্য—মনোরঞ্জন অর্থাৎ নায়িকাকে খুশি করা। এই রকম বাক্য বলা যেতে পারে—'রূপের সঙ্গে এত গুণের মিলন বড় একটা দেখা যায় না, তোমার মধ্যেই দেখলাম।'

আর একদিন কথা প্রসঙ্গে হয় তো বিস্ময়ের ভাণ করে বলবে—'আচ্ছা তুমি এমন গুণবতী, তোমার স্বামী এমন কেন? তুমি যাই ভাবো না কেন, তোমার স্বামী তোমার যোগ্য নয়।' —এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নায়িকার মুখ চোখের ভাবান্তর হয় কিনা তা লক্ষ্য করবে। যদি অনুকূল মনে হয়, তবে কানের কাছে এই মন্ত্রজপই চলতে থাকবে—'তোমার স্বামী তোমার যোগ্য নয়।' যাতে স্বামীর অযোগ্যতা সম্পর্কে তার মনে একটি পাকা সংস্কার গড়ে ওঠে। যখন দেখবে কাজ হচ্ছে, তখন স্বামীর দোষগুলির

কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে থাকবে—দোষ প্রত্যেকেরই থাকে, এক্ষেত্রে সেইগুলিই বাড়িয়ে বলতে হবে যাতে নায়িকা ক্রমশঃ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

তারপর একদিন নায়কের প্রসঙ্গ উঠবে। চমৎকার অনুকূল নায়ক, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে তুলনাহীন—বেশ বড়ো ঘরের ছেলে ইত্যাদি। এখানেও সতর্ক থাকতে হবে—উচ্ছ্বাস যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। একদিন গল্প করে উঠবার সময় যেন হঠাৎ মনে পড়ল এই ভাবে বলবে—'একটা অদ্ভুত গল্প তোমায় বলি শোন—সেই যে ভদ্রলোকের কথা তোমাকে বলছিলাম—তিনি কবে কোথায় তোমাকে দেখেছেন জানি না, কিন্তু দেখার পর থেকেই একেবারে পাগলের মতো হয়ে গেছেন। কোনো দিন কাউকে দেখে এমন আসক্ত হন নি, এমন দুঃখও পান নি। এখন সব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসীর মতো হয়ে গেছেন—তোমাকে না পেলে হয় তো মৃত্যুই ওর পরিণাম।'

এর পরও যদি নায়িকা বলে—আবার এসো। কিংবা পরদিন এলে আসন বিছিয়ে দেয় তবে বুঝতে হবে, দূতী বিজয়িনী। উৎসুক হলে সে নিজেই তুলবে এই প্রসঙ্গ। নায়িকা পরনারী—সেই কারণে যদি তার কোনো দ্বিধা থাকে তবে তা দূর করতে গিয়ে দূতী বলবে অহল্যার কথা। অহল্যা গৌতম ঋষির স্ত্রী হয়েও উপভোগের জন্য কামনা করেছিল দেবরাজকে। দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের বেশে এসে অহল্যার সঙ্গম কামনা তৃপ্ত করেন। বলবে—'এ তো মনের প্রবৃত্তির বিনিময় মাত্র; মনের ভাব প্রচ্ছন্ন রেখে পুড়ে মরায় কোনো লাভ নেই; যা মনে উদিত হবে তা কার্যে পরিণত করাই মনুষ্যত্ব রক্ষা।' নায়িকাকে জানিয়ে দেবে—নায়ক কামকলায় সুনিপুণ—আর প্রচ্ছন্ন স্থানে সঙ্গমের ব্যবস্থা হতে পারে।

এই কথা বলার সময় দূতী নায়িকার মুখের ভাব লক্ষ্য করবে। দূতী এমন সহজ ভাবে কথাটি বলবে—যাতে নায়িকার মনে হয়,

ইতিমধ্যেই সঙ্গম হয়ে গেছে, দূতী যেন তার বিবরণ দিচ্ছে।

কি কি লক্ষণ দেখে বিচার করবে নায়িকা অনুকূল? এত সব কথার পরেও যদি সে মধুর হেসে সম্ভাষণ করে, কোথায় ছিলে, কেমন ছিলে, কোথায় কোথায় বেড়িয়ে এলে—এই সব প্রশ্ন করে, নির্জন স্থানে দূতীর সঙ্গে দেখা করে, পুরাণ কাহিনী শুনতে চায়, কিছু কিছু প্রীতির বশে দান করে, 'আবার এসো' বলে বিদায় দেয়।

দূতী যখন বলবে—'নায়ক তো বার বার এই কথাই বলছে—এমন দিন কি আর হবে যে আমি ওর অধর সুধা পানে হৃদয়ের জ্বালা জুড়োতে পারব?'—তখন নায়িকা লজ্জিত কণ্ঠে বলবে—'তুমি যা-ই বল বাপু, তোমার এই মানুষটি বড় অসভ্য!'

বাৎস্যায়নের মতে, নায়ক পরিচিত হোক বা না-ই হোক, নায়িকার কাছ থেকে কোনো ইঙ্গিত আসুক বা না-ই আসুক—দূতী যদি দক্ষ হয় তবে সকল স্থানেই কার্য সিদ্ধি হতে পারে।

কিন্তু মিলন কুঞ্জ কোথায় হবে?

বাৎস্যায়ন বলেন—নায়িকার বাড়িতেই যদি প্রবেশের পথ আর বেরিয়ে যাবার পথ ভালো জানা থাকে আর কোনো রূপেই বিপদের কিছু মাত্র সম্ভাবনা না থাকে—তবে সেইখানে সমাগমের ব্যবস্থা করা সঙ্গত। কিন্তু প্রতিদিনের জন্য এই ব্যবস্থা হতে পারে না, নায়িকার পক্ষে প্রতিদিন সে স্থানে উপস্থিত থাকাও সম্ভব নয়। নিত্য সমাগমের কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, সমস্ত ব্যাপার-টিতেও বিশেষ সতর্কতা বাঞ্ছনীয়।

আগে যে তিন প্রকার দূতীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে—তাছাড়া আরও চার প্রকার দূতীর উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন স্বয়ং-দূতী, ভার্যাদূতী, মূকদূতী এবং বাতদূতী।

স্বয়ংদূতী দু' শ্রেণীর হতে পারে—আত্মার্থা ও পরার্থা। পরের

দ্বারা প্রেরিত হয়ে যদি দূতী নিজেই নায়কের সঙ্গে উপভোগে প্রবৃত্ত হয় তবে তাকে বলা হবে স্বয়ংদূতী। নির্জনে সে নায়ককে প্রশ্ন করবে—আচ্ছা বল তো, আমি ও তোমার ভার্যা—এই দুজনের মধ্যে কে বেশী রমণীয়?

নিজের অজ্ঞা স্ত্রীকে দূতী রূপে পাঠানো যেতে পারে। নায়িকার বিশ্বাস উৎপাদন করে স্ত্রীর সাহায্যেই কৌশলে দূতীর কর্ম করাবে। এরা ভার্যাদূতী।

যদি নিজের ভার্যার দ্বারা দূতীর কর্ম না হয় তবে কি করবে? তখন কোনো সরলা পরিচারিকাকে দূতী রূপে পাঠাবে—সে হবে মূকদূতী—নিজে কিছুই বলবে না। ক্রমশঃ নায়িকার সঙ্গে পরিচয় স্থাপিত হবার পর মালা বা অন্য উপহারের মধ্যে গোপনে প্রেমপত্র পাঠাবে এবং দূতীর সাহায্যেই উত্তর প্রার্থনা করবে।

নায়ক ও নায়িকার মধ্যে পূর্বঘটিত বিষয়ের স্মরণার্থ বচন যা অন্যের বোধগম্য নয়; সাধারণ লোকের জ্ঞাত বিষয়ের প্রকাশক ভাষায় বা দ্ব্যর্থক বাক্যে যে উদাসীন নায়ক বা নায়িকাকে শোনায় তার নাম বাতদূতী।

পতির উপর বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি প্রধান দূতীকর্ম। নায়কের চরিত্র রমণীয়; নায়ক অনুকূল এবং কামকলায় অভিজ্ঞ—এই রূপ বর্ণনা করাও দূতীরই কর্ম। এ ছাড়া দূতী নায়কের অনুরাগ ও রতিকৌশল বর্ণনা করবে। নায়কের গোপন প্রার্থনা শোনাবে—সেই সঙ্গে এই কথাও শোনাবে যে অনেক স্ত্রী নায়ককে কামনা করে, যারা লাভ করেছে তারাই কৃতার্থ হয়েছে। অবসর বুঝে এ কথাও বলবে—নায়কের সঙ্কল্প, হয় তোমাকে পাবে, নয় তো মৃত্যুবরণ করবে।
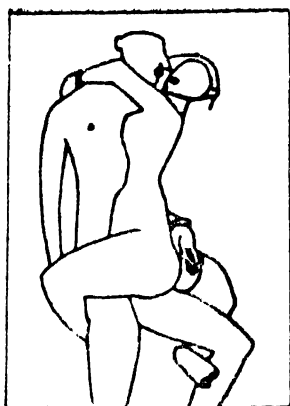
পঞ্চম অধ্যায়

ধনেশ্বরের কামনা

অতুল ঐশ্বর্যের যারা অধিকারী—তারাই ধনেশ্বর। এখন, এদের কামনা তৃপ্তির উপায় কি? এরা সমাজে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত—অসদ্ অভিপ্রায়ে পরগৃহে এরা প্রবেশ করতে পারেন না। এতে লোক নিন্দার আশঙ্কা আছে।

তাছাড়া, সমাজের যারা নেতৃস্থানীয় তাদের চালচলন দেখেই সাধারণ লোকে তাদের অনুকরণ করবে—শিখবে। এ কথা তো সবাই জানে, মহাজনেরা যে আচরণ করেন, অন্যেরা সেই আচরণ অনুকরণ করবে।

আকাশে সূর্যকে উদিত হতে দেখেই মানুষও উঠে পড়ে শয্যা থেকে, আর তাকে আলোক বিকিরণ করতে দেখে তারাও নিজের নিজের কাজে ব্রতী হয়।

এই কথা ভেবেই রাজা বা অমাত্যদের পরের গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

তাহলে এই মহাজনদের কি উপায় হবে?

উপায় একটা না হলে চলে না যদি এমন অবস্থা হয়, তবে সেই অবস্থা বুঝে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

এখন, ব্যবস্থা দু' রকম—প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য; ধনেশ্বরগণও দু' শ্রেণীর—ক্ষুদ্র আর মুখ্য।

প্রথমে ক্ষুদ্র ধনেশ্বরদের কথা বলা হচ্ছে—

প্রথমতঃ প্রজার স্ত্রীদের মধ্য থেকে বাছাই করে তাদের নিজ সংসারের বিচিত্র কর্মে নিয়োগ করতে হবে—কর্ম অনেক প্রকার—

১. পেষণ বা কোটার কাজ, কিংবা রান্নার কাজ।

২. বিভিন্ন শস্যের ভাণ্ডার নির্মাণ করে ওখানে থেকে খাদ্যশস্য আনা নেওয়ার কাজ।

৩. গৃহসজ্জার কাজ।

৪. বীজ রক্ষণের কাজ।

৫. ক্রয় বিক্রয় ও বিনিময়ের কাজ।

এমনি আরও অনেক কাজে পরনারীদের নিযুক্ত করা যেতে পারে। আর এই সমস্ত বিচিত্র কর্মের মধ্যেই সুবিধে মতো গোপন মিলনেরও ব্যবস্থা করা অসম্ভব নয়।

যেমন গোশালায় এসেছে যে দোহন বা দধিমন্থনের জন্য গোশালার অধ্যক্ষ তাকেই অবকাশ মতো দোহন করতে পারেন; উচ্চপদস্থ নগররক্ষী রাত্রে নগর পরিদর্শন কালে পথিক রমণীদের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন; তবে স্ত্রী-চরিত্র সম্পর্কে এদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

অষ্টমী চন্দ্র (অগ্রহায়ণ মাসে) কোজাগর এবং অন্যান্য বাসন্তী উৎসবের সময় নগরের সুন্দরীরা অন্তঃপুরে আসেন ঈশ্বর ভবনের অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে বিচিত্র ক্রীড়ায় যোগদান করতে। এই সব ক্রীড়া কালে গৃহাগত নারীগণ খেলার আগে বা পরে অন্তঃপুরিকাদের ঘরে বসে গল্পচ্ছলে কিছুকাল নিশ্চয়ই থাকবে।

সেখানে পানের ব্যবস্থা থাকবে।

অবশ্য ধনেশ্বরই এই ব্যবস্থা করবেন। সুযোগ বুঝে পানের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হবে।

এই ভাবে সারাদিন কাটবে—সন্ধ্যায় ধনিভবন থেকে ওরা বেরিয়ে যাবে।

ওদের মধ্যে যে নির্বাচিত তার কাছে গিয়ে পূর্ব ব্যবস্থা মতো এক দাসী বলবে—এসো, তোমাকে রাজভবনের সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখাব। ওকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সে এই সব দেখাবে—উপবন, প্রবাল প্রাসাদ, সমুদ্র গৃহ আরও কত কি। দেখাবার সময় দাসী ফাঁকে ফাঁকে বলবে—'তোমার উপর প্রভুর কি অনুরাগ!'

এই সময়ে স্বয়ং প্রভু এসে দেখা দিতে পারেন। দাসী কথিত 'অনুরাগ' যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ দেবেন। এই ভাবে কয়েকটা দিন যাবে।

কিন্তু প্রায় রোজই তাকে অন্তঃপুরে আনাবে—প্রচুর পান, উপহার, মধুর সংলাপ—সবই চলবে। তারপর একদিন দৈহিক মিলনের জন্য কোনো অসাধ্য সাধন করতে হবে না।

কিন্তু সঙ্গমের জন্য নির্বাচিতা নারী যদি পূর্বেই অন্যের সঙ্গতা হয়ে থাকে তখন কি কর্তব্য। তাকে দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাবে। স্ত্রীকে বলবে—এ নারী ভ্রষ্টা, আমি একে আশ্রয় দিয়েছি বলে রাজার বিদ্বেষভাজন হলাম! যাক, আশ্রয় যখন দিয়েছি, ফেলে তো দিতে পারি না। ও থাক অন্তঃপুরে—তোমার সেবা করাই হবে ওর কাজ।

যিনি স্ত্রীর সেবিকা, এর পর তিনি যদি সহসা একদিন প্রভুর সেবা করে বসেন তবে প্রভু নিশ্চয়ই বিরূপ হবেন না।

এতক্ষণ ধনেশ্বরের কাম উপভোগের যে ব্যবস্থার কথা বলা হল—তার নাম 'প্রচ্ছন্ন যোগ', কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই প্রচ্ছন্ন যোগ চলবে নিজের গৃহে. অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন হয়েও ধনেশ্বর কখনও পরের গৃহে প্রবেশ করবেন না—নীচের এই কাহিনীটি সযত্নে মনে রাখবেন—

গুজরাটে 'কোট্ট' নামক একটি স্থান আছে। আভীর ছিলেন সেই স্থানের অধীশ্বর। নগরের শ্রেষ্ঠী বসুমিত্রের ভার্যা সুন্দরী—আভীর তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তারপর একদিন কামোপভোগ চরিতার্থ করার জন্য আভীর চলে গেলেন বসুমিত্রের গৃহে।

বসুমিত্রের ভ্রাতা তা জানতে পেরে এক রজককে নিযুক্ত করলেন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য। সেই রজকের হাতে প্রাণ হারালেন কামার্ত আভীর।

আসল কথা, যদি কাম চরিতার্থ করতে হয় ধনেশ্বর তা প্রকাশ্য ভাবেই করবেন। যে দেশে পূর্বাচার্যগণ যেমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন সেই ব্যবস্থা মেনেই তাকে এ পথে অগ্রসর হতে হবে। তাহলে—ধনেশ্বরদের নির্দিষ্ট দেশাচার তারা অনুসরণ করছেন এই কথা ভেবে সাধারণ লোক আর তাকে অনুকরণ করবে না। তারা মনে করবে সেই আচারে কেবল ধনেশ্বরদেরই অধিকার, অন্যের সে অধিকার নেই।

দেশাচার কি?

যেমন অন্ধ্র দেশে এই আচার প্রচলিত আছে—বিবাহিতা নগর কন্যা দশম দিনে কিছু বস্ত্রোপহার নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে; রাজা তাকে উপভোগ করেন। তিনি তাকে ছেড়ে দিলে সে গৃহে ফিরে আসে।

বিদর্ভ দেশে এই আচার প্রচলিত—রূপবতী জনপদ-সুন্দরীগণ প্রীতিচ্ছলে পনেরো দিন বা এক মাস রাজার অন্তঃপুরে গিয়ে অন্তঃপুরিকা স্ত্রীরূপে থেকে রাজার সঙ্গম সুখ ভোগ করে থাকে।

ভারতের পশ্চিম প্রান্তস্থিত একটি দেশের নাম 'অপরান্তক' (বাসুবংশ চতুর্থ সর্গে এই দেশের নামোল্লেখ আছে)—এই দেশের প্রচলিত রীতি এই দেশবাসী নিজের সুন্দরী ভার্যাকে প্রীতির দান হিসাবে রাজাকে দান করে থাকে।

সুরাট দেশের আচার এই সেখানকার নগরের নারীগণ রাজার সঙ্গে সঙ্গম কামনায় দলে দলে কিংবা এক এক করেও রাজকুলে প্রবেশ করে থাকে।

পরনারীকে অবলম্বন করে এ রকম বহু দেশে বহু আচার নানা দেশে প্রচলিত আছে; কিন্তু রাজা লোকহিতে রত—সুতরাং এ ব্যাপারে রাজা নিজে উৎসাহিত হবেন না—অন্যকেও উৎসাহিত করবেন না। ষড়রিপুকে দমন করতে পারলেই রাজা পৃথিবীজয় করতে সমর্থ হবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অন্তঃপুরিকা

যেমন ধনেশ্বরগণের পক্ষে পরের গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ—তেমনি অন্তঃ-পুরিকা রমণীগণও পরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারে না। বাইরের অন্য কোনো পুরুষের পক্ষেও অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

অন্তঃপুর সুরক্ষিত; সুতরাং এখানে যে রমণীরা থাকে তাদের পক্ষে পরপুরুষ দর্শন আর হয়ে উঠে না। এদের কি করে তৃপ্তি হবে ?

অনেক সময় এরা পুরুষকেই স্ত্রীবেশে সাজিয়ে অন্তঃপুরে নিয়ে আসতে পারে। এ বিষয়ে ধাই বা দাসী তাদের সাহায্য করে থাকে। পরপুরুষের সঙ্গে অন্তঃপুরিকাদের যাতে সুখসংসর্গ হতে পারে তার জন্য এরা যদি উদ্যোগী হয় তবে আর চিন্তার কোনো কারণ থাকে না।

এরাই ঈপ্সিত পুরুষকে জানিয়ে দেবে—কখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হবে—কখন বেরিয়ে যেতে হবে, রক্ষীরা কখন একটু অসতর্ক থাকে, রাজার লোকজন কখন কখন থাকে না—এ সব তথ্য আগে থেকেই ভোগী পুরুষদের জানিয়ে দিতে হবে।

অন্তঃপুরিকা যদি নিজের মনের ভাব না জানায় তবে অন্তঃপুরে প্রবেশ না করাই ভালো। বাৎস্যায়ন বলেছেন, পুরুষ সুলভ হলেও

সব দিক না ভেবে তাকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাবে না—তাতে অনর্থ হতে পারে।

রাজাদের প্রমোদবনে বা ক্রীড়োন্থানে অনেক বড় বড় নিভৃত কক্ষ থাকে, সেখানে রক্ষীরাও খুব অসাবধানে প্রহরীর কাজ করে; তাছাড়া রাজাও হয়তো প্রবাসে আছেন— ; আসল কথা, দাসীরাই বলে দিতে পারবে কখন নিরাপদ এবং তারা সময় নির্দেশ না করা পর্যন্ত ও পথে অগ্রসর না হওয়াই ভালো। সময় বা সুযোগ পেলে এবং যোগ্যতা থাকলে প্রতিদিনই অন্তঃপুরে যাওয়া-আসা চলতে পারে; কিন্তু আগেই বলেছি আসার ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করাই সঙ্গত।

অন্তঃপুরিকাদের পরপুরুষ সংসর্গ বিষয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রথা প্রচলিত আছে।

অপরান্তক দেশে এই প্রথা প্রচলিত আছে যে রাজকুলচারিণীগণ লক্ষণসম্পন্ন পুরুষদের অন্তঃপুরে নিয়ে আসে—তাদের ছল এই, অন্তঃপুর সুরক্ষিত নয়, সুতরাং রক্ষার ব্যবস্থাটি সুদৃঢ় করার জন্য পুরুষ দরকার।

আভীরক দেশবাসীদের মধ্যে দেখা যায়, অন্তঃপুরিকারা অন্তঃপুর রক্ষীদের সঙ্গেই গোপনে মিলিত হচ্ছে; অবশ্য মিলনের জন্য কেবল পুরুষ হলেই হবে না—ক্ষত্রিয় কি না তা ওরা পরীক্ষা করে নেয়।

যারা কেবলমাত্র আদিষ্ট হয়ে ভিতরের ও বাইরের কাজ করে থাকে এমন স্ত্রীলোককে বলে প্রেষ্যা। বাৎস্যা-গুল্মক দেশে এই নিয়ম প্রচলিত যে প্রেষ্যাদের সঙ্গেই সেই রকম বেশে সজ্জিত হয়ে বাইরে থেকে পুরুষরা অবাধে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে।

বিদর্ভদেশে প্রচলিত নিয়ম আরও প্রশংসার যোগ্য; ধনেশ্বরের নিজের পুত্রেরাই কামচারী; তারা খুশিমত অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে

সংসর্গ করে, অবশ্য একমাত্র জননীকে বাদ দিয়ে (জননীবর্জম্ উপযুজতে)।

স্ত্রীরাজ্যে এই নিয়ম প্রচলিত যে শুধু জ্ঞাতি সম্বন্ধীদের সঙ্গেই অন্তঃপুরিকারা সঙ্গত হচ্ছে, কেননা, এদের পক্ষে অন্তঃপুরে প্রবেশ সহজ। গৌরদেশে অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গম চলে ব্রাহ্মণ, মিত্র, ভৃত্য, দাস ও ভাঁড়দের সঙ্গে। ভৃত্য, মিত্র, দাস বা ভাঁড় আসবে অন্তঃপুরে এতে কারও প্রশ্ন জাগবে না। ব্রাহ্মণই বা বাদ যাবেন কেন? তিনি অন্তঃপুরে আসবেন ফুল দিতে।

হিমবদ্-দ্রোণী দেশের নিয়ম একটু পৃথক; সেখানে রক্ষি পুরুষকে অর্থে বশীভূত করে সাহসিক নায়কগণ প্রবেশ করেন অন্তঃপুরে। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেও ভালো ব্যবস্থা। সেই সেই নগরবাসী ব্রাহ্মণগণ ফুল দিতে আসেন অন্তঃপুরে—অবশ্য অন্তঃপুরে প্রবেশটা রাজার জ্ঞাতসারেই হয়। অন্তঃপুরিকা নারীদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ আলাপ হয় না, তারা থাকেন পটের অন্তরালে; কিন্তু পরবর্তী সঙ্গমটা সাক্ষাৎ ভাবেই হতে হয়। তবু সর্বত্র একটা শুচি ও সংযত পরিবেশ—ফুল, ব্রাহ্মণ, নেপথ্য সংলাপ।

প্রাচ্যদেশে দেখা যায় অন্য নিয়ম। সেখানে অন্তঃপুরিকা রমণী নয় দশটি যুবককে মিলিত করে তার মধ্য থেকে বেছে নেয়—কোন্‌টি রতিনিপুণ। তারপর কথা-বার্তা, ক্রীড়া-কৌতুক চলতে থাকবে—কিন্তু সেই নির্বাচিত ব্যক্তিটিকে আর দেখা যাবে না—ওকে প্রচ্ছন্ন রাখবার দায়িত্ব নিতে হবে অন্তঃপুরিকাকেই। তারপর সবাই বিদায় নিয়ে চলে যায়। অন্তঃপুরিকা তার নির্বাচিত পুরুষটিকে বিদায় দেয় একটু পরে।

এই রকম নানা দেশে পরনারী সঙ্গম বিষয়ে বিভিন্ন রীতি প্রচলিত। এই সব তত্ত্বই কামসূত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে জেনে নিতে হবে—বুঝে নিতে হবে, তারপর সঙ্গমের জটিল পথে অগ্রসর হতে হবে।

একটি জটিল প্রশ্ন উঠতে পারে।

সাহসী কামচারী পুরুষ যেমন পরনারীকে সঙ্গম দোষে দূষিত করবে তেমনি নিজের নারীকে অর্থাৎ নিজের স্ত্রীকেও তো অন্যে দূষিত করতে পারে! তাহলে অন্যের কবল থেকে 'স্বদার রক্ষা' কি ভাবে করতে হবে?

কামপরীক্ষায় উত্তীর্ণ শুদ্ধ রক্ষিগণকেই অন্তঃপুরে স্থাপন করবে—এই কথা আচার্যগণ বলে থাকেন। কিন্তু কামের পরীক্ষায় না হয় উত্তীর্ণ হল—রক্ষী ভয়ে বা অর্থের লোভে অন্যকে সাহায্য করতে পারে।

বাৎস্যায়ন মনে করেন, ধর্ম পরীক্ষায় শুদ্ধ ব্যক্তি পরনারীতে সঙ্গত হয় না, অর্থলোভেও প্রভুর বিরোধী হয় না। কিন্তু ভয়ে ধর্মকেও বিসর্জন দেয়। সুতরাং ধর্ম ও ভয়ের পরীক্ষায় শুদ্ধ ব্যক্তিকে অন্তঃপুর রক্ষায় নিযুক্ত করা উচিত।

ভার্যার রক্ষা এবং পরীক্ষা একসঙ্গেই চলবে।

শুচি বা অশুচি এইটুকু জানবার জন্যই পরীক্ষা। অত্যন্ত গোপনে এই পরীক্ষা চালাতে হবে—স্ত্রী যাতে স্বামীর উদ্দেশ্য কোনো ক্রমেই বুঝতে না পারেন। হঠাৎ অর্থের বা অন্য কোনো বস্তুর লোভ দেখিয়ে পরীক্ষা করতে যাবে না। অন্তরে শুচি থাকলেও মন চঞ্চল বলে হয়তো লোভ সংবরণ করতে না পেরে স্বীকৃত হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে অর্থের লোভ দেখিয়ে শুধু তার চরিত্র দূষণের সাহায্য করা হল। যে 'দূষিত' বলে সন্দেহের বিষয় নয়, পরীক্ষার ছলে তার দূষণ করা অসঙ্গত।

নারীচরিত্রের বিনাশ কারণগুলি জেনে রাখা ভালো—

১. পতির অতিরিক্ত মাত্রায় স্ত্রীগোষ্ঠীতে নৃত্য করে বেড়ানো
২. স্বামীর উচ্ছৃঙ্খল জীবন নীতি
৩. স্বামীর নিয়ন্ত্রণের অভাব
৪. কোনো পুরুষের সঙ্গে 'নিয়ন্ত্রণাদি' সম্বন্ধ থাকা; অর্থাৎ সেই

পুরুষের কথা শ্রবণ করা, তার মুখ দর্শন করা, তার বিষয় চিন্তা করা, তার রূপ গুণের প্রশংসা করা, তার প্রভুত্ব মেনে নেওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধ থাকা

৫. ভ্রষ্টচরিত্রা নারীর সঙ্গে সংসর্গ

৬. স্বামীর প্রতি ঈর্ষা

প্রসঙ্গ শেষে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। এই গ্রন্থের পঞ্চম প্রসঙ্গ—'পরনারী' বিষয়ক; সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই প্রসঙ্গের আলোচ্য বস্তুগুলিকে গ্রহণ করতে হবে। পরনারীতে সঙ্গত হওয়ার নির্দেশ দান এই আলোচনার লক্ষ্য নয়। ধর্ম ও অর্থের বিরোধী বলে পরনারী সঙ্গম সর্বথা বর্জনীয়—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। সাধারণের দোষ প্রচারও এই আলোচনার লক্ষ্য নয়। মানুষের মঙ্গলের জন্য, নারী রক্ষার জন্যই এই আলোচনা।

পঞ্চম প্রসঙ্গের অন্তর্গত ছয়টি অধ্যায় এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই পড়তে হবে।

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ

সঙ্গম

প্রথম অধ্যায়

যোনিযন্ত্র
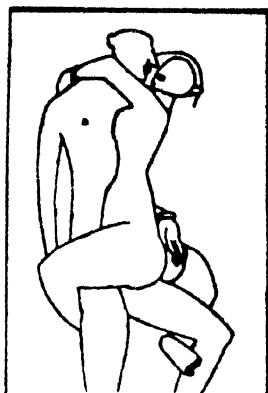
স্ত্রীসাধন ব্যাপারটিই শত্রু রাজ্য জয়ের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। যে শাস্ত্রজ্ঞানহীন তার পক্ষে স্ত্রীসাধন নিয়ে মাতামাতি করতে যাওয়াই অসঙ্গত হবে। যখন তন্ত্রপাঠের ফলে সঙ্গম-ব্যাপার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান হবে তখন আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকর্ম—যেমন, চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতির প্রয়োগ অনুরাগ প্রকাশের জন্যই করা হবে।

এই অধ্যায়ে প্রমাণ (আকার) কাল ও ভাবানুযায়ী সঙ্গমের ব্যবস্থা। প্রথমে প্রমাণ অনুযায়ী সঙ্গমের কথা বলা হচ্ছে।

লিঙ্গের আকার অনুযায়ী নায়কের ভেদ তিন প্রকার—শশ, বৃষ ও অশ্ব। সেই ভাবে নায়িকারও তিন প্রকার—মৃগী, বড়বা এবং হস্তিনী। পূর্বাচার্যগণ বলে থাকেন—শশ, বৃষ ও অশ্বের লিঙ্গ দৈর্ঘ্যে ছয়, নয় ও দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ হয়ে থাকে। যেমন লম্বা—তেমন চওড়াটাও কমবেশি হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেন, ঠিক দৈর্ঘ্যের মতো প্রস্থ না-ও হতে পারে—কিছু কম বা বেশীও দেখা যায়।

তেমনি মৃগী, বড়বা (ঘোটকী) অথবা হস্তিনীর যোনিযন্ত্রও লম্বায় ও বিস্তারে (অর্থাৎ চওড়ার মাপে) যথাক্রমে ছয়, নয় ও দ্বাদশ অঙ্গুলি হয়ে থাকে। এদের যোনিযন্ত্রের বিস্তার কম হয় না—বরং কিছু বেশীই হয়।

সমানে সমানে (অর্থাৎ সমান মাপের লিঙ্গ ও যোনিতে) যে সঙ্গম হয় তাকে বলে **সমরতি**। সমরতি তিন প্রকার: শশের সঙ্গে মৃগীর, বৃষের সঙ্গে বড়বার এবং অশ্বের সঙ্গে হস্তিনীর সঙ্গম সমান। কারণ তাদের লিঙ্গ এবং যোনিযন্ত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সমতা আছে।

সমতা না থাকলে সেই সঙ্গমকে বলা হবে **বিষমরতি**। বড়বা ও হস্তিনীর সঙ্গে শশের (খরগোসের), মৃগী (হরিণী) ও হস্তিনীর সঙ্গে বৃষের, এবং মৃগী ও বড়বার সঙ্গে অশ্বের সঙ্গম—বিষমরতি।

সমরতিই শ্রেষ্ঠ, কারণ এতে যন্ত্রের সমতা থাকায় উভয়েরই পরিতৃপ্তি হয়। পুরুষের লিঙ্গ এবং স্ত্রী-যোনি যদি অসমান হয় তবে সঙ্গমে অতি-পীড়া কিংবা অতি-শৈথিল্য বশতঃ স্পর্শসুখলাভ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

প্রমাণ অনুযায়ী রতি-কথা শেষ হল।

এখন ভাব অনুযায়ী রতির তত্ত্ব।

ভাব দুই প্রকার—হেতু ও ফল। হেতুভাবের দ্বারাই নায়ক সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়। সঙ্গমের পরে যে ভাব হয় তা-ই ফলভাব। সুতরাং সঙ্গমের আগে যে কামভাব জাগে তা যদি মন্দীভূত হয় বা সঙ্গম ক্রিয়া যদি মন্দীভূত হয় তবে নায়ক হবে 'মন্দবেগ'। তার সঙ্গে শুক্রধাতুও অল্প থাকে আর নায়িকা নখদন্তাদি দ্বারা ক্ষত করতে থাকলে তা সে সইতে পারে না।

অবশ্য, একদিন এরূপ হলেই তাকে মন্দবেগ বলা যাবে না; যদি তার প্রকৃতিই এই মন্দবেগের হয় তবেই সে মন্দবেগ হয়।

সঙ্গমকালে যার রতিভাব, বীর্য বা ক্ষত সহনশক্তি মাঝারি গোছের সে 'মধ্যবেগ' নায়ক। আর যার রতিভাব তীব্র, বীর্য অত্যধিক এবং ক্ষতসহনশক্তিও অধিক, সে হবে 'চণ্ডবেগ' নামক নায়ক। চণ্ডবেগ নায়কের রতিক্রিয়াতেও কোনো শিথিলতা থাকে না।

ঠিক এই নীতি অনুযায়ী নায়িকাকেও তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে হবে—মন্দবেগা, মধ্যবেগা ও চণ্ডবেগা। এখানে সমরতি এবং বিষমরতির প্রশ্ন উঠবে। মন্দবেগার সঙ্গে মন্দবেগের, মধ্যবেগার সঙ্গে মধ্যবেগের এবং চণ্ডবেগার সঙ্গে চণ্ডবেগের সঙ্গমই সমান এবং প্রশস্ত; এর বিপর্যয় ঘটলেই বিষমরতি।

কাল অনুযায়ীও সঙ্গম তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—শীঘ্রকাল, মধ্যকাল ও চিরকাল। যার শীঘ্র রতিসুখ হয় সেই পুরুষ যদি সেই জাতীয় নায়িকার সঙ্গে সঙ্গম করে তবে সেই সঙ্গম চিহ্নিত হবে 'শীঘ্রকাল' এই নামে; এই ভাবে মধ্যকালার সঙ্গে মধ্যকালের সঙ্গমকে বলা হবে 'মধ্যকাল' এবং চিরকালার সঙ্গে চিরকালের মিলনকে বলা হবে 'চিরকাল।' চিরকাল অর্থ অধিক কাল।

বিষমরতির প্রশ্ন এখানেও উঠবে। শীঘ্রকালের সঙ্গে মধ্যকালা বা চিরকালার সঙ্গম বিষমরতি ছাড়া আর কি! অবশ্য, চিরকালের সঙ্গে শীঘ্রকালা ও মধ্যকালার সঙ্গমই শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু কাল অনুযায়ী যে স্ত্রীলোকের রতি হয় এ কথা সকলেই মানেন না। তারা বলেন শুক্রস্খলনে পুরুষ যে সুখ অনুভব করে, স্ত্রীলোক সেই সুখ অনুভব করতে পারে না, কারণ তাদের শুক্র নেই!

তবে তারা পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করে কেন?

পুরুষের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হবার কারণ সঙ্গমের সাহায্যে পুরুষ তাদের যোনির কণ্ডুয়ন (চুলকানি) দূর করে থাকে।

ঐ চুলকানি সৃষ্টি করে যোনিরূপ মদনগৃহে বসবাসকারী অসংখ্য সূক্ষ্ম কৃমি। এরা রক্তে জাত এবং মৃদুশক্তি, মধ্যশক্তি ও উগ্রশক্তি-সম্পন্ন। অনবরত পুরুষলিঙ্গের ক্ষেপন ও উন্নয়নের দ্বারা যোনির ঐ চুলকানির নিরসন হয়ে থাকে। নিরসন না হলে ওরা কামোন্মাদ হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং যে স্থান থেকে চুলকানির নিরসন শুরু হয়েছে, সেই স্থান থেকেই সুখানুভব হওয়ায় স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সুখানুভব পৃথক।

স্ত্রীলোকের প্রিয় কার্য কণ্ডুয়নের প্রতিকার। পুরুষ যদি অল্পকালের মধ্যে নিজের ব্যাপারটা শেষ করে নেয় তাহলে স্ত্রী তার প্রিয় কার্যের সিদ্ধি না হওয়ায়, বিরক্তি প্রকাশ করে।

সঙ্গমকালে পুরুষ নারীর কণ্ডুয়ন দূর করে। সুতরাং সঙ্গমের সূচনা থেকেই স্ত্রী সুখানুভব করতে থাকে আর পুরুষ শুক্রস্খলনের পর সুখানুভব করে।

কেউ কেউ বলেছেন স্ত্রীলোকের রজঃ সঙ্গমকালে স্খলিত হয়—শুক্র নয়। কিন্তু যদি তা শুক্র না হয় কি ভাবে গর্ভসঞ্চার হয়? যেমন পুরুষ সংসর্গে স্ত্রী গর্ভ ধারণ করে, তেমনি স্ত্রী সংসর্গেও স্ত্রী গর্ভধারণ করে থাকে। সুশ্রুতকার বলেছেন—'যখন কোনো নারী কোনো নারীর সঙ্গে মৈথুনে প্রবৃত্ত হয় তখন তারা উভয়েই শুক্রত্যাগ করে—তাতে গর্ভ হলে সে গর্ভে অস্থি সঞ্চার হয় না, একটি সজীব মাংস পিণ্ড জন্মে থাকে। দেহস্থ সাতটি ধাতুর মধ্যে (রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি, শুক্র) রস থেকে উৎপন্ন শোণিতই কোনো অবস্থায় 'আর্তব' (রজ) বলে চিহ্নিত হয়। আর্তব ও শুক্র এক নয়; শুক্র স্ত্রীলোকেরও আছে—তার স্খলনে সে সুখানুভব করে। শুক্র স্খলনই সুখের কারণ বলে যে সময়ে তার ঋতুকাল নয় তখনও সে শুক্রত্যাগ-জনিত সুখ অনুভব করে। সুতরাং আর্তব ও শুক্র এক পদার্থ নয়। স্ত্রীলোকের সপ্তম ধাতু শুক্র নেই এ কথা বলতে সাহস করা-ই অন্যায়। তবে তাদের শুক্র ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন আকারের। ডিম্বগত শুক্র লালাকৃতি পদার্থ বিশেষ—শুক্র থেকে উত্থিত বর্জিত ভাগ। তা পুরুষেরও আছে। সময় বিশেষে কোনো সুন্দরীর দিকে সকাম মনোভাব নিয়ে থাকাকালীন সেই লালাজাতীয় পদার্থ পুরুষের লিঙ্গেও এসে

উপস্থিত হয়। এই পদার্থ স্ত্রীলোকের যোনিযন্ত্রে অধিক মাত্রায় থাকায় সঙ্গমের সূচনাতেই তা ক্ষরিত হতে থাকে। সঙ্গম পূর্ণতা লাভ করলে চরম ধাতু শুক্র স্বয়ং স্খলিত হয়; কিন্তু গর্ভের কারণ অন্য; যখন স্ত্রীলোকের শুক্র স্খলিত হয় তখন সেই শুক্রের স্খলনবেগে আর্তবেরও স্খলন হয়। আর্তবের সঙ্গে ডিম্বকোষ থেকে একটি বা একাধিক ডিম্ব এসে স্ত্রীশুক্রের সহিত পুরুষের লিঙ্গ-পরিত্যক্ত শুক্রে মিলিত হয়।

পুরুষের শুক্রে জীবকীট আছে—একটি বা একাধিক জীবকীট সেই হলদে ডিম্বকে আশ্রয় করে। এইবার সেই স্খলন-প্রবণ আর্তব, জীবকীটাণুবিদ্ধ ডিম্বের সঙ্গে পুং শুক্রবিন্দুকে অবলম্বন করে বিপরীত গতিতে ধীরে ধীরে জরায়ু কোষে প্রবেশ করে।

জরায়ু কোষ নিমীলিত হয়ে যায়। পরম তৃপ্তিতে স্ত্রীলোকের হয় তন্দ্রাবেশ। দুই শুক্রের স্খলন, আর্তবের শ্রাব—এই তিনের বিপরীত বেগে জরায়ুতে প্রবেশ—এতেই হয় নারীর পরম সুখানুভূতি– এতে হয় তৃপ্তি। বুদ্ধিমতী নারী বুঝতে পারে, গর্ভ সঞ্চার হল। সুতরাং বাভ্রব্য যে বলেছেন—'পরিপূর্ণ তৃপ্তি না হলে গর্ভ সঞ্চার হতে পারে না'।—সে কথা সম্পূর্ণ সত্য।

পুরুষের সুখানুভব হয় সঙ্গমের অবসানে, নারীর সর্বদাই সুখানুভব হতে থাকে। সঙ্গমে বিরামের ইচ্ছা উভয়েরই হতে পারে তবে এই অনিচ্ছা ধাতুক্ষয়-জনিত অবসাদের ফলে।

বাভ্রব্য বলেছেন—যে ক্ষেত্রে পুরুষের লিঙ্গ স্ত্রীর যোনিতে সম্পূর্ণভাবে ঘর্ষিত হয় এবং ভাব ও কাল সমান সেই সঙ্গমই শ্রেষ্ঠ। যেখানে লিঙ্গের ছোট-বড় ভাব আছে, ঘর্ষণ ভালোভাবে হয় না, ভাব ও কামও বিপরীত—সেই সঙ্গম বাঞ্ছনীয় নয়।

সকল বিষয়ে সাম্য থাকলেই রতি-ব্যাপার শোভন হয়ে থাকে, আর তা না থাকলে সমস্ত ব্যাপারটাই হয় দুঃখজনক। প্রথম

রতিতে পুরুষের বেগ এবং স্থায়িত্ব অল্পকাল—স্ত্রীর পক্ষে আবার যতক্ষণ ধাতুক্ষয় না হয় ততক্ষণ এর বিপরীত ভাব ও কাল হয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, স্ত্রীর ধাতুক্ষয়ের পূর্বেই পুরুষের ধাতুক্ষয় হয়, পরে স্ত্রীর ধাতুক্ষয় হয়। অবশ্য চুম্বন, আলিঙ্গন ও বিভিন্ন অঙ্গুলিকর্মের সাহায্যে স্ত্রীজাতিকে উৎসাহিত করে নিলে তারা অতি সত্বরই প্রীতিলাভ করে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলিঙ্গন যোগ
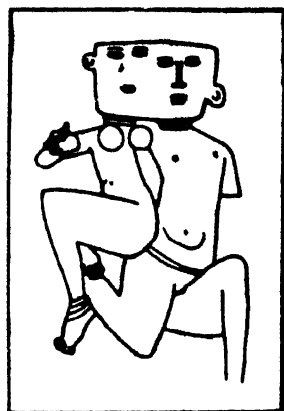
কলা চৌষট্টি প্রকার। এরা সঙ্গমের অঙ্গ। বাভ্রব্যের মত যারা অনুসরণ করেন তারা বলেন—আলিঙ্গন, চুম্বন, নখচ্ছেদ্য, দশনচ্ছেদ্য, সম্বেশন, সীৎকৃত, পুরুষায়িত ও ঔপরিষ্টক—এই আটটির প্রত্যেকটিরই আট প্রকার ভেদ থাকায় সব মিলিয়ে চৌষট্টি কলা।

বাৎস্যায়ন বলেন, 'চৌষট্টি' কথাটি প্রাস্থিক রূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত—কেননা, আটটি করে বিকল্প ভেদের কথা বলা হয়েছে—তাতে সংখ্যার কমবেশী আছে।

সকলের আগে আলিঙ্গন, পরে চুম্বনাদির প্রয়োগ। সুতরাং আলিঙ্গনের কথাই প্রথমে বলা যাক।

আলিঙ্গন প্রীতির চিহ্ন, এতে কোনো সঙ্গম নেই। প্রীতির প্রকাশের জন্য আলিঙ্গন চার প্রকার—পৃষ্টক, বিদ্ধক, উদ্‌ঘৃষ্টক এবং পীড়িতক।

১. **পৃষ্টক**—অর্থাৎ স্পর্শ করে থাকাই পৃষ্টক আলিঙ্গন। সর্বত্র নামের অর্থের মধ্যেই কর্মের স্বরূপ বোঝানো হয়েছে।

নায়িকা আসছেন ; সাধারণভাবে তাকে আলিঙ্গন করা সম্ভব নয় , তখন নিজের অনুরাগ জানাবার জন্য অন্য কাজের ছলে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় গা ঘেঁষে চলে গেলাম—এর

নামই পৃষ্ঠক আলিঙ্গন। এতে অন্য কেউ জানবে না যে ইচ্ছে করে তার গায়ে স্পর্শ করা হয়েছে।

২. **বিদ্ধক**—যাকে বিদ্ধ করতে হবে সেই নায়ক কোনো বিজন স্থানে উপবিষ্ট থাকলে নায়িকা কাছে আসবে—তারপর অন্য কিছু গ্রহণ করবার ছলে নিজের স্তনের দ্বারা নায়ককে বিদ্ধ করবে। নায়কও অবশ্য বাহুপাশে তাকে পীড়িত করবে।

যাদের মধ্যে একেবারেই সম্ভাষণ হয় নি তাদের পক্ষে এই দুই শ্রেণীর আলিঙ্গন পরিত্যজ্য।

৩. **উদ্‌ঘৃষ্টক**—কোনো পর্ব উপলক্ষ্যে দেবালয় বা যাত্রাদিস্থানে যেখানে বহু লোকের ঠেলাঠেলি ভীড়—সেই সকল স্থানে ধীরে ধীরে বহুক্ষণ ধরে নায়িকার অঙ্গে ও নায়কের অঙ্গে যে ঘর্ষণ তাকে বলে উদ্‌ঘৃষ্টক।

৪. **পীড়িতক**—যে কোনো অন্য ব্যক্তিকে বা অভাবপক্ষে কোনো স্তম্ভকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে পীড়িত করা—এর নাম পীড়িতক।

উদ্‌ঘৃষ্টক বা পীড়িতক—এই দুইয়ের মাধ্যমে নায়ক-নায়িকা একে অন্যকে তার মনের ভাব জানাবে। যদি জানানো সফল হয় তবেই এ দুটি প্রয়োগ করবে।

এই চারটি ছাড়া আরও চার প্রকারের আলিঙ্গন আছে তবে এদের প্রয়োগ কেবল সঙ্গম কালে। এই চারটি আলিঙ্গনের নাম—লতাবেষ্টিতক, বৃক্ষাধিরূঢ়ক, তিলতণ্ডুলক, এবং ক্ষীরনীরক। সঙ্গমকালে যখন উভয়েই ভাবরসে সিক্ত তখনই এই সব প্রয়োগ করবে।

৫. **লতাবেষ্টিতক**—লতা যেমন বৃক্ষকে বেষ্টন করে থাকে তেমনি নায়ককে বাহুপাশে বেষ্টিত করে অতিরিক্ত সীৎকার না করে চুম্বনের জন্য নিজের মুখ তুলে ধরে নায়কের মুখ নীচু করে আনবে। একেই বলা হয় লতাবেষ্টিতক।

৬. **বৃক্ষাধিরূঢ়ক**—নায়িকা তার এক পা দিয়ে নায়কের এক পা আক্রান্ত করে, দ্বিতীয় পা দিয়ে উরুদেশ আক্রান্ত করবে। তারপর এক হাত দিয়ে নায়কের পিঠ বেষ্টন করে দ্বিতীয় বাহু দিয়ে তার কাঁধ নীচু করে মৃদু সীৎকার করবে। চুম্বনের জন্যই আরোহণ করতে চাইবে; একেই বলা হয় বৃক্ষাধিরূঢ়ক।

সীৎকার কি? সঙ্গমকালে স্ত্রীর কণ্ঠে উচ্চারিত একপ্রকার অব্যক্ত ধ্বনি। ধ্বনি আরামসূচক।

৭. **তিলতণ্ডুলক**—শয্যায় শায়িত নায়ক ও নায়িকা বাম কক্ষ দিয়ে দক্ষিণ বাহু এবং দক্ষিণ কক্ষ দিয়ে বাম বাহু জড়িয়ে ধরবে। এই ভাবে দক্ষিণ পদের উরুর উপরে বাম উরু ও বাম উরুর উপরে দক্ষিণ উরু বিন্যাস করবে। অর্থাৎ অত্যন্ত গাঢ়ভাবে পরস্পরকে সংঘর্ষ করবার জন্যই সুন্দররূপে অঙ্গে অঙ্গে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরবে—এরই নাম তিলতণ্ডুলক।

৮. **ক্ষীরনীরক**—নায়কের ক্রোড়ে নায়কের দিকে মুখ করে বসে আছে নায়িকা—অথবা নায়িকা শুয়ে আছে। এই অবস্থায় নায়িকার দেহ বেষ্টন করে রাগান্ধতা-বশতঃ অস্থিভঙ্গ প্রভৃতি তুচ্ছ করেই যেন একে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করবে। এর নাম ক্ষীরনীরক।

সঙ্গমকালেই শেষোক্ত প্রযোজ্য। যখন পুরুষাঙ্গ উন্নত হবে, যোনিযন্ত্র ক্লেদাক্ত হবে অথচ যন্ত্রযোজনা হয় নি—তখন এই দু'রকমের আলিঙ্গন প্রয়োগ করবে।

বাভ্রব্য এইভাবে আলিঙ্গন যোগ ব্যাখ্যা করেছেন। পার্শ্বস্থ স্ত্রী বা পুরুষের একটি বা দুটি উরুকে স্ত্রী বা পুরুষ নিজের উরু দিয়ে সাঁড়াশি দিয়ে ধরার মতো দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরবে। যার উরু বিশাল সে-ই উদ্যোগী হবে। মাংসল স্থলে পীড়ন করলেও সেই পীড়ন অত্যন্ত সুখকর। এর নাম **উরূপগূহন**।

স্তনদ্বয় দ্বারা নায়কের বক্ষঃস্থলে চাপ দিয়ে দেহের সমস্ত ভার সেখানে অর্পণ করবে—এর নাম **স্তনালিঙ্গন**। মুখে মুখ দিয়ে, চক্ষুতে চক্ষু দিয়ে ললাট দিয়ে ললাটে আঘাত করবে। এই ক্রিয়ার নাম ললাটিকা।

আর এক প্রকার আলিঙ্গনের নাম **উত্তানসম্পুট** (অর্থাৎ নায়কের উপরে নায়িকার অবস্থান) বা পার্শ্বসম্পুট' (এই আলিঙ্গনে নায়ক নায়িকা পাশাপাশি অবস্থায় থাকবে); এই অবস্থায় থেকে মুখে মুখ, চোখে চোখ লাগিয়ে কপালে কপাল দিয়ে দু'তিনবার আঘাত করবে।

সংবাহনকেও একপ্রকার আলিঙ্গন বলা হয়। সংবাহন কি? অন্যের পক্ষে সুখকর হয় এভাবে গা-হাত-পা বুলিয়ে দেওয়াকেই বলে সংবাহন। এর উদ্দেশ্য অন্যকে আরাম দেওয়া। সংবাহনকে আলিঙ্গন বলা হয় এই জন্য যে এর দ্বারাও এক প্রকার গভীর স্পর্শসুখের অনুভব হয়ে থাকে।

তিনপ্রকার সংবাহন (অঙ্গমর্দন) আছে যা ত্বকের, মাংসের বা অস্থির পক্ষে আরামদায়ক। সংবাহনকে যারা আলিঙ্গন বলতে চান তাদের মতে ঐ তিন প্রকার সংবাহনকেও আলিঙ্গন হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু বাৎস্যায়নের মতে সংবাহন আলিঙ্গন অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক—কেননা এ দুটির প্রয়োগের কাল পৃথক; সংবাহন ও আলিঙ্গনের প্রয়োজন পৃথক; তাছাড়া সংবাহন উভয়েরই স্পর্শ-সুখকর নয়।

যদিও স্পর্শসুখ দুটিতেই আছে তবু একমাত্র সঙ্গমকালেই আলিঙ্গন বিধেয়, আর সংবাহন রতিশ্রমের পরে। আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার; সংবাহন পুরুষ করলে নারীর এবং নারী করলে পুরুষের আরামদায়ক হয়ে থাকে। এদিক দিয়েও আলিঙ্গন থেকে সংবাহন পৃথক। তাছাড়া সংবাহনের উদ্দেশ্য—'অর্থ', তাই

নৃত্যগীত প্রভৃতি চৌষট্টি কলার মধ্যে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

বাৎস্যায়ন আর একটি আপত্তি তুলেছেন। কেবলমাত্র স্পর্শ-সুখকর বলেই যদি সংবাহনকে আলিঙ্গনের অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তবে চুম্বনকেও আলিঙ্গন বলা উচিত, কেননা স্পর্শসুখ এতেও আছে। সুতরাং তিনি মনে করেন সংবাহন ও আলিঙ্গন একজাতীয় নয় এবং একই উদ্দেশ্যে এদের প্রয়োগও করা হয় না।

দুই

আসলে আলিঙ্গন অনুরাগবর্ধক এক রীতি। আলিঙ্গন যারা করেন তারা তাদের অনুরাগ বাড়াবার জন্যই করুন অথবা বর্ধিত অনুরাগের চিহ্ন প্রকাশের জন্য আলিঙ্গন করুন—তারা বুঝতে পারেন, আলিঙ্গনের পদ্ধতি নিঃশেষরূপে বলে দেওয়া যায় না। কামশাস্ত্রে উল্লিখিত হয় নি এমন পদ্ধতিও প্রচলিত থাকতে পারে—যদি থাকে তবে সাদরে সেই পদ্ধতিকে গ্রহণ করা দরকার। কারণ, সঙ্গমকালে অনুরাগ বৃদ্ধিই যখন আলিঙ্গনের উদ্দেশ্য তখন নূতন কোনো পদ্ধতিকে মেনে নিতে কোনো বাধা থাকতে পারে না।

যে সময়ে অনুরাগের বেগ মন্দীভূত তখন শাস্ত্র অনুশাসন রচনা করে সেই বেগ বৃদ্ধি করতে পারে—কিন্তু তার সময় 'যন্ত্র'টা চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। ততক্ষণ পর্যন্ত আদর, সোহাগ, আলিঙ্গন, বিধি, ক্রম সবই। তারপর চাকা একবার ঘুরতে শুরু করলে পর বিধি বা ক্রম তুচ্ছ মনে হয়। তখন আলিঙ্গনেরও প্রয়োজন হয় না। ক্রমেরও ঠিক থাকে না।

ঘড়ি যখন চলছে না তখন তাকে চালাবার জন্য অনেক কিছু করণীয় থাকে; কিন্তু পরিচালিত হবার পর ঘড়ি যখন চলতে শুরু করল তখন আর কারও কোনো কর্তব্য নেই। যদি বিকৃত হয় তখনও, তবেই বিধান ও বিধান পালনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

সঙ্গম ব্যাপারেও তাই। সঙ্গমযন্ত্র প্রবর্তিত হবার পূর্ব পর্যন্ত শাস্ত্রের যথারীতি পরিচর্যা চাই। শাস্ত্র যেভাবে আলিঙ্গনাদির লক্ষণ নির্দেশ করেছে সেইগুলি অর্থ বুঝে আয়ত্ত করা কর্তব্য—কিন্তু চক্র চলতে থাকলে আর শাস্ত্রের প্রয়োজন রইল না। তখন সঙ্গমক্রিয়াই বিবিধ নিয়ম আবিষ্কার করতে পারবে। সেই সঙ্গমক্রিয়াই বুঝে নেবে কোন্‌টি তার সুখকর বা অসুখকর।

তৃতীয় অধ্যায়

চুম্বন তত্ত্ব
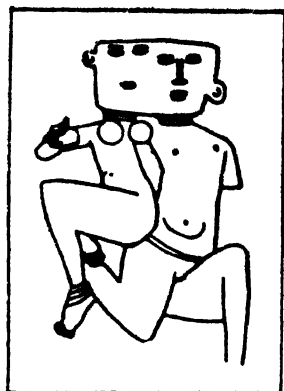
প্রথমে আলিঙ্গন করে চুম্বনাদির (চুম্বন, নখক্ষত এবং দন্তক্ষত) প্রয়োগ করতে হবে। তবে এই চুম্বন, নখক্ষত, দশনক্ষত—এই তিনের মধ্যে কোন্‌টি আগে বা কোন্‌টি পরে; এমন কোনো বিধান নেই। এক্ষেত্রে অনুরাগই নির্দেশ কর্তা, সে-ই বলে দেবে কোন্‌টি আগে বা কোন্‌টি পরে।

তবে চুম্বন, নখক্ষত বা দশনক্ষত—এগুলি 'যন্ত্র'যোগের আগেই করা হয়ে থাকে। 'যন্ত্র'যোগ শুরু হলে—এদের আর প্রাধান্য থাকে না।

সঙ্গম কালে এদের আর প্রাধান্য থাকে না, কিন্তু আর দুটি ব্যাপার প্রধান হয়ে উঠে—প্রহণন আর সীৎকার। 'প্রহণন' শব্দটির অর্থ প্রকৃষ্ট আঘাত; পুরুষাঙ্গ দিয়ে যোনীযন্ত্রে বার বার আঘাত করাকেই বলে 'প্রহণন'। সঙ্গমকালে এই ব্যাপারটিই প্রধানতম। সীৎকার -শব্দটির অর্থ, 'প্রহণন' চলাকালীন নারীকণ্ঠে উচ্চারিত অব্যক্ত আরামসূচক ধ্বনি।

রতিকালে নায়ক নায়িকা উভয়েরই উত্তেজনা ও অনুরাগ বৃদ্ধি পায়—তাই তাদের ঘাতসহন ক্ষমতা বাড়ে। সীৎকারের হেতু প্রহণন—সীৎকারের প্রাধান্য রতিকালে।

বাৎস্যায়ন বলেছেন, এ সবই অনুরাগ নির্ভর—তাই এদের কালনির্দেশ অসঙ্গত। প্রয়োজন অনুযায়ী (অর্থাৎ অনুরাগ অনুযায়ী) সকল কালেই এদের প্রয়োগ চলে।

দুই

চুম্বন কয় প্রকার? দেহের কোন্ কোন্ স্থানে এবং কখন চুম্বন প্রশস্ত?

ললাট, অলক, কপোল, নয়ন, বক্ষ, স্তন, ওষ্ঠ, মুখের মধ্যভাগ, উরুসন্ধি, বাহুমূল এবং নাভিমূল—লাটদেশবাসীদের মতে চুম্বনের স্থান এই এগারোটি। এগুলির মধ্যে 'বক্ষ' পুরুষের, 'স্তন' নারীর, অবশিষ্ট স্থান উভয়ের। কোনো দেশের প্রবৃত্তির উপর চুম্বনের স্থান নির্ভর করে। যেমন লাটগণ উরুসন্ধি প্রভৃতি স্থান চুম্বন করে। কিন্তু তা সর্বজনসম্মত নয়। শিষ্টজন সে স্থান অশুচি বলে চুম্বন করতে পারেন না।

অবশ্য, এ মত শ্রদ্ধেয় নয়, কেননা, শিষ্টজনও রাগান্ধ হয়ে যোনিতে পর্যন্ত চুম্বন করে থাকেন এমন প্রায়ই শোনা যায়।

যাই হোক, উরুসন্ধি (কুঁচ্‌কি), বাহুমূল (বগল) এবং নাভিমূল (যোনি ও পুরুষলিঙ্গ)—এ তিনটি বাদ দিয়ে শিষ্টজনের পক্ষে চুম্বনের স্থান আটটি।

মুখে মুখে যোগ করাকেই চুম্বন বলে। সেই মুখ হবে 'মুকুলীকৃত' অর্থাৎ ওষ্ঠাধরের মধ্যে ফাঁক থাকবে না। চুম্বনের প্রসঙ্গে মুখেরই প্রাধান্য—তাই মুখের চুম্বনই আলোচিত হচ্ছে।

যে নায়িকা সঙ্গম সুখ উপভোগ করে নি, নায়কের প্রতি যার পূর্ণ বিশ্বাস আসে নি—এমন কন্যার চুম্বন তিনপ্রকার—নিমিতক, স্ফুরিতক এবং ঘট্টিতক। কন্যাই নায়িকা এবং এই তিন প্রকার চুম্বনের কর্ত্রী।

জোর করে তার মুখ নায়ক তার নিজের মুখে স্থাপন করেছে, কিন্তু কন্যা লজ্জায় চুম্বন করতে চেষ্টা করছে না—এই চুম্বনকে বলা হয় নিমিতক। 'নিমিতক' অর্থাৎ পরিমিত চুম্বন।

নায়িকার মুখে নায়ক নিজের অধর স্থাপন করেছে। অল্প মাত্রায় লজ্জা শিথিল করেছে নায়িকা। চুম্বন গ্রহণ করতে ইচ্ছা তবু নিজের ওষ্ঠ ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে—এবং নায়কের অধর নিজের অধরে রাখতে দেয় না; আবার যদি নায়ক নিজের অধর সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে তবে নায়িকা নিজের অধরোষ্ঠ দিয়ে চেপে রাখতে চেষ্টা করে—এই জাতীয় চুম্বনকে বলে **স্ফুরিতক**।

নায়িকা নিজের হাত দিয়ে নায়কের চোখ ঢেকে দিয়েছে, 'এমন অবস্থায় আমাকে না দেখুক'—এই তার ইচ্ছা। তারপর, নিজের চোখ দুটিও নিমীলিত করেছে লজ্জায়; শেষে লজ্জায় নায়কের অধর শিথিল ভাবে ধরে নিয়ে নিজের জিহ্বাগ্র দিয়ে চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে—কোথায় নায়কের অধর? এই চুম্বনের নাম **ঘট্টিতক**।

অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন, চুম্বন চার প্রকার।

সম, বক্র, উদ্‌ভ্রান্ত এবং **অবপীড়িতক**।

সমান সমান মুখ রেখে যে অধরোষ্ঠ গ্রহণ তাকে বলে **সম** চুম্বন। পরস্পর এই চুম্বনকে সাগ্রহে এবং অনুকূল ভাবে গ্রহণ করবে। যে চুম্বন অধরোষ্ঠ বাঁকিয়ে, গোলাকার করে গ্রহণ করা হয় সেই চুম্বন **বক্র**; যে চুম্বনে চিবুক ও মস্তক ধরে, মুখ ঘুরিয়ে অধরোষ্ঠ গ্রহণ করা হয়, সেই চুম্বনের নাম **উদ্‌ভ্রান্ত**; আর সেই অবস্থায় যদি অত্যন্ত পীড়িত করে চুম্বন করা যায় তবে তার নাম **অবপীড়িতক**।

এই চুম্বন অবস্থা ভেদেও অন্য নাম গ্রহণ করতে পারে।

নায়ক নিদ্রিত; তার মুখ দেখতে দেখতে নায়িকা নিজের

অভিপ্রায় অনুযায়ী যে চুম্বন করবে তার নাম **রাগদীপন** ; 'রাগদীপন' নাম এই জন্য যে এভাবে চুম্বন করলে নায়িকার অনুরাগ উদ্দীপিত হবে। নায়ক চুম্বিত হয়ে জেগে উঠবে। জাগ্রত নায়কের পক্ষেও এটি প্রযোজ্য হতে পারে—তবে সেক্ষেত্রে চুম্বনের নাম **সাম্প্রয়োগিক**। (সঙ্গমের সঙ্গে যার সম্বন্ধ)

গীত ও চিত্র দর্শনে নায়কের চিত্ত প্রসন্ন—তার প্রসন্নতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে হবে ; নায়িকার সঙ্গে বিবাদে রত যে নায়ক তার কলহে বাধা দিতে হবে; অন্য দিকে মন যে নায়কের তার মন নিজের দিকে আনতে হবে ; নিদ্রায় উৎসুক নায়কের নিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে হবে— এই সব উদ্দেশ্য নিয়ে নায়িকা নায়ককে যে চুম্বন করে তার নাম **চলিতক**।

অসময়ে বা অধিক রাত্রে সমাগত নায়ক সুপ্তা নায়িকার স্বাভিপ্রায় অনুসারে যে চুম্বন করবে—তার নাম **প্রাতিবোধিক**। নায়িকা অবশ্য নায়কের অনুরাগ জানবার জন্যই—নায়ক এসেছে জেনেও ছল করে নিদ্রিত থাকবে। নায়ক এসে যদি প্রাতিবোধিক চুম্বন দেয় তবেই সে জানতে পারবে নায়ক অনুরক্ত।

নায়কের সংবাহনে রতা নায়িকা ; নিদ্রা বশে যেন সে ইচ্ছা না করেই নায়কের উরুযুগলে মুখ রাখবে এবং উরু চুম্বন করবে—তারপর পাদাঙ্গুষ্ঠ চুম্বন করবে। এই চুম্বনের নাম **আভিযোগিক**। কেননা, এর প্রয়োজন—অভিযোগ। অভিযোগ অনেকটা এই ধরণের —'আমি তোমায় ভালোবাসি, তুমি ভালোবাস কি ? মনে হয়—না।'

নায়িকা যে জাতীয় চুম্বন করবে—নায়ককেও সে জাতীয় চুম্বন করে তার প্রতিকার করতে হবে। নইলে নায়িকা নায়ককে মনে করবে স্তম্ভ—যার কোনো চেতনাই নেই, না-হয় পশু, অর্থাৎ মনুষ্যত্ব বোধহীন। ফলে, নায়িকা বিরক্ত হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

নখবিলেখন

আলিঙ্গন ও চুম্বন ব্যাখ্যাত হয়েছে—এই সব প্রক্রিয়ায় অনুরাগের বৃদ্ধি হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই বর্ধিত অনুরাগকে যদি আরও বাড়াতে হয় তবে **নখবিলেখন** প্রয়োগ করতে হবে।

নখবিলেখন কি ?

অল্প কথায়, নখের দ্বারা 'আঁচড়ানো'কেই বলে নখবিলেখন। এই পদ্ধতির প্রয়োগ কখন কার উপর করতে হবে ?

প্রথম সঙ্গম কালে, প্রবাস থেকে ফিরে এলে, ক্রুদ্ধা নায়িকা প্রসন্ন হলে এবং মদ্যপানে মত্তা নায়িকার উপর এর প্রয়োগ কর্তব্য। যারা মন্দবেগ ও মধ্যবেগ—অর্থাৎ যারা চণ্ডবেগ নয়, নখবিলেখন ঠিক তাদের জন্য নয়। তাদের উপরে কদাচিৎ কখনও প্রয়োগ করলেই চলবে। চণ্ডবেগ নায়ক নায়িকাই নখবিলেখনের উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী।

অনুরাগ বৃদ্ধি হলে অঙ্গে যেমন নখ দিয়ে আঁচড়ানো চলে, দাঁত দিয়ে কামড়ানোও চলে। একে সাধুভাষায় বলা হয় **দশনক্ষত**; দশনক্ষত সৃষ্টি করাও অনুরাগের বর্ধক। তবে নখবিলেখনের ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর প্রকৃতি ও যোগ্যতা বিচার করা উচিত।

নখবিলেখন

নখবিলেখন দুই শ্রেণীর—'রূপবৎ' এবং 'অরূপবৎ'; নখক্ষত যে

লেখন কারও আকারের অনুকরণ করে তাকে বলে 'রূপবৎ', যে লেখন তা করে না তাকে বলে 'অরূপবৎ'।

কক্ষদ্বয়, স্তনদ্বয়, গলদেশ, পৃষ্ঠদেশ, কটি ও নিতম্ব, উরুযুগল—এইগুলি নখবিলেখনের স্থান। অবশ্য, জনৈক আচার্য বলেছেন—যে নায়ক-নায়িকার রতিক্রীড়া শুরু হচ্ছে এবং যাদের বেগ প্রচণ্ড তাদের পক্ষে আর স্থান-অস্থান কিছুই নেই।

বিলেখন নখের অধীন; সুতরাং লেখনের জন্য নখের কিছু কিছু গুণ থাকা চাই। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—চণ্ডবেগ নায়ক-নায়িকার বাঁ হাতের নখ হবে দুই তিন শিখর বিশিষ্ট অর্থাৎ অনেকটা করাতের দাঁতের মতো। তাছাড়া, নখের অগ্রভাগ হবে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ। মন্দবেগ ও মধ্যবেগ নায়ক-নায়িকার নখ থাকবে এর ঠিক বিপরীত।

নখে বিবিধ বর্ণের রেখা থাকবে—উপরের অংশ সমান হবে—অর্থাৎ উঁচু বা নীচু হবে না। নখ হবে মৃদু অর্থাৎ কোমল ও স্নিগ্ধ।

নখের গুণের কথা বলা হল।

নখবিলেখন আট প্রকার—আচ্ছুরিতক, অর্ধচন্দ্রক, মণ্ডল, রেখা, ব্যাঘ্রনখ, ময়ূরপদক, শশপ্লুতক এবং উৎপলপত্রক।

১. **আচ্ছুরিতক**—বাঁ হাতের পাঁচটি নখ নায়িকার চোয়ালে, স্তনের উপরে, অধর প্রান্তে আলগা ভাবে রাখবে। পরে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করবে—এবং যাতে রেখাপাত না হয় এমন ভাবে লঘু ক্রিয়া করবে। এই ক্রিয়ার ফল একমাত্র স্পর্শ। তাতে শেষে রোমাঞ্চ হবে। পরে সেই পাঁচটি নখ সবেগে অল্পমাত্র চর্ম স্পর্শ করে চালিত হবে—সেই ক্রিয়াকেই বলা হয় 'আচ্ছুরিতক'। শব্দটির অর্থ—নখের দ্বারা ক্ষত।

নায়িকার অঙ্গ সংবাহন যে যে অংশে করতে পারা যায়—সেই সেই অংশে 'আচ্ছুরিতকের' প্রয়োগও চলে।

২. **অর্ধচন্দ্রক**—রতিকালে নায়িকার গ্রীবায় ও স্তনপৃষ্ঠে বাঁকা ভাবে নখ বসিয়ে দেওয়া হলে তাকে বলা হবে অর্ধচন্দ্রক। এই

অর্ধচন্দ্র গ্রীবার পাশে হবে বহির্মুখ আর স্তনে ঊর্ধ্বমুখ। কনিষ্ঠা ও মধ্যমার সূক্ষ্মাগ্র নখে অর্ধচন্দ্র আঁকতে হবে।

৩. **মণ্ডল**—দুটি অর্ধচন্দ্র সামনাসামনি অঙ্কিত হলে যে গোলাকার রেখা তৈরি হয়, তাকে মণ্ডল বলে। এর প্রয়োগ হবে নাভিমূলে (যোনির উপরিভাগে), উরুসন্ধি স্থলে (কুঁচ্‌কিতে) এবং নিতম্বের উপরে।

৪. **ব্যাঘ্রনখ**—স্তনদ্বয় থেকে শুরু করে কণ্ঠ পর্যন্ত রেখা বাঁকা ভাবে প্রয়োগ করলে সেই রেখার নাম ব্যাঘ্রনখ।

৫. **ময়ূরপদক**—পাঁচটি নখ সামনাসামনি রেখে স্তন যুগলের শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত যে রেখা অঙ্কিত করা যায় তাকে বলে ময়ূরপদক।

স্তনমুখ-নীচে অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করে স্তনতটে অঙ্গুলিগুলি ঘন ভাবে রেখে বোঁটার দিকে আকর্ষণ করবে। এতে যে রেখা পড়বে তাকে ময়ূরপদক বলা হয়। ময়ূরের পদের আকার বলেই এই নাম।

৬. **শশপ্লুতক**—যে নায়িকা নায়কের সঙ্গমকে গর্বের বিষয় মনে করে তার স্তনের বোঁটায় পাঁচটি নখ মিলিত ভাবে চেপে ধরবে। এতে যে রেখা পড়বে তার নাম শশপ্লুতক।

৭. **উৎপলপত্রক**—স্তনের পীঠে ও মেখলার পথে (যে স্থানে চন্দ্রহার ধারণ করা হয়, অর্থাৎ কটিদেশে) পদ্মপত্রাকার রেখাপাতকে উৎপলপত্রক বলা হয়। স্তনের পীঠে থাকবে একটি পাতা আর মেখলার পথে থাকবে অনেক পাতা।

৮. **রেখা**—এই রেখা খুব দীর্ঘ হবে না। দেহের সকল স্থানেই এই রূপ রেখাপাত করা যায়।

এই ভাবে অন্যান্য আকৃতিযুক্ত রেখাও করা যেতে পারে। পাখি, ফুল, পাতা, কলস, লতা প্রভৃতির আকারও সেই সেই স্থানে অঙ্কিত করা চলে।

আচার্যগণ মনে করেন, এই জাতীয় নখবিলেখনের আকার বা প্রকার অনেক, রেখাপাতের কৌশলও অনন্ত। এই রেখাঙ্কনের

অভ্যাস সকলেরই থাকতে পারে।

যে রেখা মনের অনুরাগকে প্রকাশ করবে তার প্রকার-সংখ্যা কে নির্ণয় করতে পারে? সুতরাং নখবিলেখন উপরে বর্ণিত শুধু আট প্রকারই নয়—এর প্রকার অনন্ত। সঠিক সংখ্যা নির্দেশ করা কঠিন। লেখন-কৌশলও নিয়মিত অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। অভ্যস্ত না হলে বিচক্ষণ শিল্পী—যত বড় প্রেমিক তিনি হোন, একটা গোলমাল বাধিয়ে বসতে পারেন। প্রেমিক শিল্পীর তুলি যে এখানে তীক্ষ্ণ নখ—সেইটেই চিন্তনীয়।

যাই হোক, আচার্যগণের অভিপ্রায় এই যে, অভ্যাসে দক্ষ হলে লেখনক্রিয়ায় প্রেমিকের হাত আসবে; তখন সে ইচ্ছেমতো বুদ্ধি খাটিয়ে বা নিজের কল্পনার সাহায্যে উক্ত আট প্রকার 'লেখন' ছাড়াও অন্য প্রকার 'লেখন শিল্প' আয়ত্ত করতে পারবে।

এই বিলেখন বিদ্যা সকল নায়িকায় প্রয়োগ করা অসঙ্গত। এই বিদ্যার সার্থকতা এইখানে যে নায়ক প্রবাসী হলে, নায়িকা তাকে স্মরণ করতে পারবে—ভাবতে পারবে—'ওর অনুরাগের কত রূপ, ওর যৌবনের কত গুণ!' দেহের প্রচ্ছন্ন প্রদেশে অর্থাৎ উরু, স্তন, কটি, নাভিমূল প্রভৃতি স্থলে নখক্ষত চিহ্নগুলি দেখতে দেখতে রমণীর মনে পরিত্যক্ত প্রেমও আবার নতুন রূপ দেবে, শিথিল প্রীতিতেও যেন অভিনব শক্তি সঞ্চারিত হবে।

এই কারণেই কামশাস্ত্রে নখবিলেখনের এই আলোচনা।

নখক্ষতের গৌরব ঘোষণা করেছেন সংস্কৃত কবিগণ তাদের কাব্যে, নাটকে, কাহিনী-রচনায়!

নখ ও দন্ত থেকে উদ্ভূত চিহ্নগুলি যত অনুরাগবর্ধক—তত রাগবর্ধক আর অন্য কিছুই নয়!

পঞ্চম অধ্যায়

দশন-লেখা
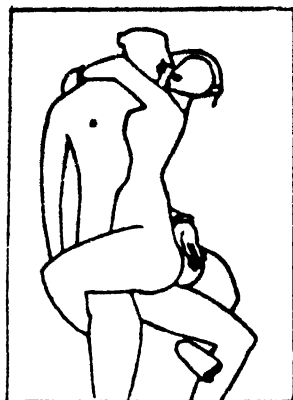
প্রথমে দন্তের গুণকীর্তন।

দন্ত হবে **সমান**, ও **স্নিগ্ধচ্ছায়া**; স্নিগ্ধচ্ছায়া অর্থ—যা খস্‌খসে নয়, যা দেখতে সুন্দর। দাঁত হবে **রাগগ্রাহী**—যা সহজে রঙ গ্রহণ করে; পান খেলে অনেকের দাঁত বেশ টুকটুকে লাল হয়ে ওঠে।

দাঁত হবে **উপযুক্ত প্রমাণ**—অর্থাৎ যোগ্য আকারের—কেউ মোটা, কেউ লম্বা, কেউ বা ঢেবা এমন নয়। ভালো দাঁতের আর একটি বিশেষণ—**নিশ্ছিদ্র**; অর্থাৎ মাঝে ফাঁক নেই, বেশ ঘননিবদ্ধ। শাস্ত্রকার আর একটি বিশেষণও দিয়েছেন—সেটি হল **তীক্ষ্ণাগ্র**—অর্থাৎ যে দাঁতের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ। প্রথম তিনটি গুণ দাঁতের শোভার জন্য; পরবর্তী তিনটি গুণ—উপযুক্ত প্রমাণতা, ঘনত্ব এবং তীক্ষ্ণাগ্রত্ব—দাঁতের শোভা সম্পাদনের জন্য তো বটেই; আর একটি কাজেও তাদের সার্থকতা, সে কাজটি হল—'লেখা'।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নখ দিয়ে লেখার কথা বলা হয়েছে—এই অধ্যায়ে থাকবে দাঁত দিয়ে লেখার কথা।

দাঁতের গুণকীর্তন করার পর মনে হতে পারে দোষ কীর্তনের প্রয়োজন নেই, কেননা যা দাঁতের গুণ তার বিপরীতই দাঁতের দোষ। তবু প্রধান দোষগুলির কথা আলোচিত হওয়ার সার্থকতা আছে। দাঁতের প্রধান দোষ এইগুলি—

কুণ্ঠব—পোকায় খাওয়া, কালচে।

রেখাযুক্তা—যার মধ্যে কেটে রেখা উদগত হয়েছে।

পরুষ—খস্‌খসে।

বিষম—কিছু উঁচু কি নীচু—এই ভাবের ট্যাড়া বেঁকা জাতীয়।

শ্লক্ষ্ণ—কৃশ।

পৃথু—মোটা।

বিরল—দাঁতের মধ্যে মধ্যে ফাঁক থাকা।

এদের মধ্যে রেখাযুক্তা, পরুষ ও বিষম—এই তিনটি মুখের শোভালোপকারী, অবশিষ্ট দোষগুলি কার্য সম্পাদনে অসামর্থ্য সৃষ্টি করে।

আলোচ্য অধ্যায়ের নাম 'দশন-লেখা'। দশন-লেখা কয় প্রকার? এদের নাম ও বিবরণ নীচে প্রদত্ত হল—

১. **গূঢ়ক**—কেবলমাত্র অনুরাগ প্রদর্শনের জন্যই এই চিহ্ন; চিহ্ন খুব লাল হবে না। একে বলে গূঢ়ক।

২. **উচ্ছূনক**—গূঢ়ক-এ যে ঈষৎ রক্তাভ চিহ্নের কথা বলা হয়েছে—সেই চিহ্ন পরিমিত স্থান ফুলে উঠলে তাকে বলা হবে 'উচ্ছূনক'। 'ফুলে উঠার' প্রশ্ন উঠছে বলেই মনে হয়, এই চিহ্ন পীড়নের দ্বারা উৎপাদিত।

৩. **বিন্দু**—এই চিহ্ন বিন্দু-পরিমিত; গূঢ়ক, উচ্ছূনক এবং বিন্দু এই তিনটির স্থান অধর (নীচের ঠোঁট)।

৪. **বিন্দুমালা**—সমস্ত দাঁত দিয়ে যে বিন্দু শ্রেণীর উৎপাদন করা যায় তাকে বলে বিন্দুমালা। ললাটে ও দুই উরুতে বিন্দুমালার স্থান।

৫. **প্রবালমণি**—দন্ত ও ওষ্ঠের সংযোগে বার বার যে পীড়ন করা যায়—তাকেই বলে প্রবালমণি। এতে ক্ষত সৃষ্টি হবে না। প্রবালমণির স্থান বাম গণ্ডদেশ (গাল)। আগে উচ্ছূনকের কথা বলা হয়েছে; উচ্ছূনক চিহ্নও বাঁ গালে হতে পারে।

৬. **মণিমালা**—দন্ত ও ওষ্ঠের পীড়ন মালার আকারে করা হলে তার নাম মণিমালা। মণিমালা যেন গণ্ডে শোভিত একটি লাল মালা।

৭. **খণ্ডাভ্রক**—স্থূল, মধ্য ও সূক্ষ্ম দাঁতের দ্বারা গোলাকারে কেবল স্তনপৃষ্ঠেই পীড়ন করবে—তাতে যে চিহ্নের সৃষ্টি হবে তার নাম খণ্ডাভ্রক।

৮. **বরাহ চর্বিতক**—স্তনের উপরিভাগের অল্প ত্বক নিয়ে দাঁতের সাঁড়াশী দিয়ে পীড়ন করবে (অর্থাৎ চর্বণ করবে)। তারপর সেটি ছেড়ে দিয়ে আর একটি স্থানে চর্বণ করবে। এই ভাবে চর্বণ করতে থাকলে চারটি কি ছ'টি দন্ত পঙক্তির রেখাপাত হবে—মধ্যভাগ দেখাবে রক্তবর্ণ। এর নাম বরাহ চর্বিতক। স্থানটি মাংসল বলেই চর্বণ সুসাধ্য এবং আরামজনক।

খণ্ডাভ্রক এবং বরাহ চর্বিতক—এই দুইটিই চণ্ডবেগ নায়ক-নায়িকার পক্ষে প্রযোজ্য। এই দুটির প্রয়োগকর্ত্রী নায়িকাও হতে পারে।

কিন্তু প্রযোক্তা যখন নায়ক তখন তিনি নায়িকার স্তনে দংশন করবেন এ কথা বলা হয়েছে কিন্তু প্রযোক্ত্রী যখন নায়িকা তিনি নায়কের কোন্ অংশ দংশন করবেন সে বিষয়ে শাস্ত্রকার নীরব।
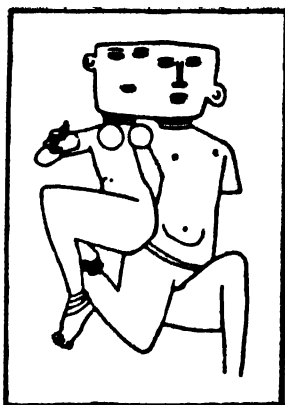
ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষম রতি ও চিত্র রতি

এক

বিষম রতি

পূর্বে আলোচিত হয়েছে (আলোচ্য প্রসঙ্গের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) —শশের মৃগীর সঙ্গে, বৃষের বড়বার সঙ্গে এবং অশ্বের হস্তিনীর সঙ্গে সঙ্গম সমান। মৃগী যদি উচ্চ-রত বা উচ্চতর-রত হয় (অর্থাৎ বৃষের সঙ্গে কিংবা অশ্বের সঙ্গে সঙ্গত হয়) তবে সে তার জঘন প্রদেশ সম্পূর্ণ ভাবে প্রসারিত করে দিয়ে বৃষ বা অশ্বের লিঙ্গ আপন রন্ধ্রে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ উচ্চ বা উচ্চতর রতিতে জঘন দেশ (নিতম্বের বিপরীত নিম্নদেশ) সম্পূর্ণ আল্‌গা করে দিয়েই নায়িকাকে সঙ্গতা হতে হবে।

আবার নীচ রতিতে হস্তিনীকে জঘন দেশ সঙ্কুচিত করে আনতে হবে। আসল কথা, যা করলে যোনিমুখ একটু সঙ্কুচিত হয় অর্থাৎ ছোট হয়ে আসে, বৃষযোগে হস্তিনী এবং নীচতর রতিতে হস্তিনী ঠিক সেই ভাবে আচরণ করবে যাতে উভয়ের সমতার আনুকূল্য হয়। এ সবই তো বিষম রতির ব্যাপার। উচ্চরতিতে উরুদ্বয় বিবৃত করে (হাঁ-করার মতো করে) নীচ রতিতে উরুদ্বয় সঙ্কুচিত করে (মুখ বোজার মতো করে) এবং সমরতিতে যেমন থাকে তেমন রেখেই সঙ্গম করবে। এর ফলে দুজনের মধ্যে প্রীতি-সাম্য হবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকবে।

রতিক্রিয়ায় নায়ক উপবিষ্ট থাকবে, তার উরুর উপরে নায়িকার

উরু বিন্যস্ত হবে—এর নাম **গ্রাম্য** ; নায়িকা যদি চিত হয়ে শুয়ে থাকে, আর তার উপর নায়ক শুয়ে থাকে, এই অবস্থায় যদি নায়কের উরুর উপর নায়িকার উরু থাকে তবে তাকে বলা হবে **নাগর**।

কটিতে ভর রেখে জঘনের উর্ধ্বাংশকে শয্যায় পেতে রাখবে। তারপর সেই জঘনকে উর্ধ্বমুখ করে তুলে ধরে বার বার রন্ধ্রে লিঙ্গ প্রবেশ করাবে আবার বাইরে নিয়ে আসবে।

দুই উরু উঁচুদিকে বাঁকাভাবে রেখেও রতি-ক্রিয়া চলতে পারে।

উভয়দিকে সমানভাবে দুই উরু বিন্যস্ত করে দুই হাঁটু স্থাপন করবে। এইভাবে রতিতে লিপ্ত হলে তার নাম **ইন্দ্রাণিক** রতি। শচী ইন্দ্রপত্নী এই প্রকার উপদেশ করেছিলেন তাই এর নাম ইন্দ্রাণিক। এতে নায়িকার গোড়ালি থেকে দুই হাঁটু পর্যন্ত ঘন নিবদ্ধ থাকবে অর্থাৎ নায়িকার হাঁটু রাখবে কোমরের বাইরে।

ইন্দ্রাণিক পদ্ধতি উচ্চতর রতিতেও কার্যকর।

নীচতর রতিতেও কয়েকটি পদ্ধতি বিহিত আছে—পদ্ধতিগুলির নাম সম্পুটক, পীড়িতক, বেষ্টিতক এবং বাড়বক। তবে এই চারটি পদ্ধতি কেবল হস্তিনীর পক্ষেই বিহিত। শশ'র সঙ্গে সঙ্গমকালে যদি 'পীড়িতক' প্রভৃতির প্রয়োগ করা যায় তবে হস্তিনীর কোনো আক্ষেপের কারণ থাকবে না।

সম্পুটক

এই পদ্ধতিতে নায়ক ও নায়িকার চরণদ্বয় সরলভাবে প্রসারিত থাকবে ; অবশ্য, যতটুকু সরল থাকলে যোনিতে লিঙ্গযোজনা সম্ভব, চরণদ্বয় ততটুকুই সরল থাকবে।

সম্পুটক দু' রকম—পার্শ্বসম্পুট এবং উত্তানসম্পুট। প্রথম পদ্ধতিতে নারীকে ডানদিকে শায়িত করে নিজে পাশে শয়ন করবে। ঐ ভাবেই রতির অনুষ্ঠান হবে। উত্তানসম্পুট-এ নায়িকা চিত হয়ে শুয়ে চরণদ্বয় সরলভাবে প্রসারিত করে দেবে। নায়কও ঠিক ঐভাবেই তার উপরে শয়ন করবে। তারপর হবে রতির অনুষ্ঠান।

পীড়িতক

নায়িকা উত্তানসম্পুটই থাক, বা পার্শ্বসম্পুটেই থাক—রতির অনুষ্ঠানে দুই জঘনের সাহায্যে নায়কের দুই উরু খুব জোরে পীড়ন করে ধরবে—এর নাম পীড়িতক। তাতে যুক্ত যন্ত্র হয়তো আল্‌গা হয়ে যাবে ; কিন্তু ব্যাপারটা বেশ আঁটসাট হবে। নায়ক চেষ্টা করে আবার যন্ত্রযোজনা করবে, কিন্তু, পীড়িতক ছাড়াবে না।

বেষ্টিতক

সম্পুটকে প্রযুক্ত যন্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরের উরু বেষ্টন করবে। একে বলে বেষ্টিতক।

বাড়বক

বডবার ন্যায় যোনির ওষ্ঠপুটের দ্বারা লিঙ্গকে নিষ্ঠুরভাবে গ্রহণ করে ধরে রাখবে। এটি অভ্যাস করে শিখতে হয়। এর নাম বাড়বক।

বাভ্রব্য—এই সাতপ্রকার রতিক্রিয়ার কথা আলোচনা করেছেন।

দুই
চিত্ররতি

কোনো একটি স্তম্ভের গায়ে ঠেস দিয়ে ঊর্ধ্বভাবে দাঁড়িয়ে পরস্পর পরস্পরকে ধরে নায়ক নায়িকা যে রতিক্রিয়ায় নিযুক্ত হয় তার নাম **'স্থিতরত'**।

স্থিতরত তিন প্রকার হতে পারে—**ব্যায়ত সম্মুখ, দ্বিতল** এবং **জানুকূর্পর**। নায়িকার একটা পা তুলে ধরে নায়ক যে রতিক্রিয়া করে তাকে বলে **ব্যায়ত সম্মুখ** ; নায়িকার কুঞ্চিত জানুদ্বয় নায়ক দুই হাতে ধরে রেখে যে রতিক্রিয়া করে তার নাম **দ্বিতল** ; নায়কের কনুইয়ের উপর নায়িকার কুঞ্চিত দুই জানু রেখে নায়ক যে ব্যাপার করে তাকে বলে **জানুকূর্পর**। (কূর্পর=কনুই)।

এইবার নায়কের পালা।

নায়ক স্তম্ভের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার কণ্ঠ দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরবে নায়িকা। নায়কের হস্ত পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত থাকবে —নায়িকা সেই হাতের উপর বসে নিজের উরু দিয়ে নায়কের জঘনদেশ বেষ্টন করবে। তারপর নায়িকা বার বার স্তম্ভে চরণের আঘাত করতে থাকবে আর সেই সঙ্গে চলবে কটি চালনা। এর নাম **অবলম্বিতক**।

মাটিতে চতুষ্পদের ন্যায় নায়িকা অবস্থান করবে—সেই অবস্থায় নায়িকার কটিভাগ জড়িয়ে ধরে নায়ক বৃষের মতো রতিক্রিয়ার অনুষ্ঠান করবে। একে বলে **ধেনুক**। এই জাতীয় রতিক্রিয়ায় নায়ক বক্ষঃস্থলে যে সব কাজ করত, সে সব কাজ নায়িকার পিঠেই সেরে নিতে হবে—উপায় নেই।
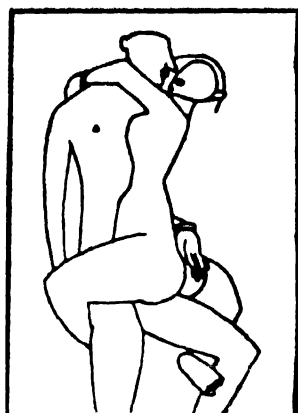
সপ্তম অধ্যায়

সুরত ও সীৎকার

সুরত (সঙ্গম, কামকেলি) ব্যাপারটিই অনেকটা যেন কলহের মতো ; উভয় পক্ষই নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয় এবং নিজস্ব তৃপ্তিলাভের পথে খানিকটা নিষ্ঠুরও হয়ে ওঠে। কামকেলিতে একটি কোমল দিকও আছে সন্দেহ নেই। দুই পক্ষই পরস্পরের প্রতি আসক্ত, কিন্তু সঙ্গমকালে দুই পক্ষই নিষ্ঠুর।

পুরুষলিঙ্গের দ্বারা যোনিযন্ত্রে বার বার আঘাত করাকেই কামশাস্ত্রে 'প্রহণন' বলা হয়ে থাকে। সীৎকার-এর জন্ম এই প্রহণন থেকে। সীৎকার ধ্বনি-স্বভাব অর্থাৎ সীৎকারও একপ্রকার অব্যক্ত ধ্বনি—যে ধ্বনি প্রহণন-জাত। রতিকালে আর একপ্রকার ধ্বনি শ্রুত হয় তাকে বলে 'বিরুত'। বিরুত ধ্বনি-স্বভাব হলেও তার সঙ্গে সীৎকারের কোনো সম্বন্ধ নেই।

বিরুত এবং সীৎকার উভয়েই ধ্বনি-স্বভাব বলে একসঙ্গেই আলোচিত হচ্ছে।

বিরুত

বিরুত-ধ্বনিতে 'প্রহণন' থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে। থাক বা না-ই থাক. বিরুত-ধ্বনি খুবই মধুর। এই ধ্বনির মূলে আছে

রতিক্রিয়া। মনে রাখতে হবে, সীৎকার কেবল প্রহণন থেকেই উত্থিত হয়—সুতরাং দুইয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যের জন্য দুই-এর আলোচনা পৃথকভাবে করা হল।

বিরুত সাত প্রকার—

হিংকার, স্তনিত, কূজিত, রুদিত, সুৎকৃত, দুৎকৃত এবং ফুৎকৃত।

হিং শব্দের অনুকরণে যে শব্দ হয়ে থাকে তাকে **হিংকার** বলে। রতিক্রিয়ায় কটিদেশের আন্দোলন কালে যে শব্দ করা হয় তা-ই 'হিংকার'। এই ধ্বনি মেঘবৎ গম্ভীর হলে হবে **স্তনিত। সুৎকৃত**—নিঃশ্বাসের বেগজাত শব্দ। **রুদিত** আসলে রোদনই—তবে সেই রোদন দুঃখদায়ক নয় বরং খুবই মনোজ্ঞ। কূজিত, দুৎকৃত আর ফুৎকৃত শব্দের লক্ষণ পরে বলা হবে।

এই সাতটিতে অক্ষর অব্যক্ত থাকে। এই সব বিরুত-ধ্বনির তাৎপর্য কোথাও অসার্থক—'মাগো, আর পারি না', কোথাও মোচনার্থক—'আঃ কি হচ্ছে, ছেড়ে দাও, সর'; কোথাও বারণার্থক—'না, আর না, থাক না'; কোথাও বা পর্যাপ্তিসূচক —'আরো, আরো চাই!' বিরুত-ধ্বনি এই সব অর্থেই প্রয়োগ করা হয়। ধ্বনিগুলি শুনতে মধুর, অর্থহীন হয়েও তাৎপর্য বহন করে।

পীড়ার্থক ধ্বনিও প্রয়োগ করা হয়—'আঃ মারা গেলাম যে! আমাকে বাঁচাও' এই সব ধ্বনিও উচ্ছ্বাস বশেই করা হয়ে থাকে। এই সব বিরুত-ধ্বনি সীৎকারের সঙ্গে (সীৎকার তো প্রহণনের সঙ্গে সঙ্গেই চলবে) মাঝে মাঝে (থেকে থেকে) প্রয়োগ করবে।

প্রহণন ও সীৎকার যে স্থানে এবং যে অবস্থায় প্রযোজ্য তার বিবরণ—

নায়িকা ক্রোড়ে উপবিষ্টা হলে নায়ক তার পিঠে মুষ্টি প্রহার করবে। মুষ্টি প্রহার করলে যেন তা সইতে পারছে না নায়িকা এই ভাবে স্তনিত, রুদিত ও কূজিত শব্দ প্রয়োগ করে তার প্রতিক্রিয়া জানাবে।

নায়িকা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকবে, নায়ক যোনিতে লিঙ্গ যোগ করার পর হস্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি করে স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে প্রহার করবে।

এই প্রহার চলবে রতিক্রিয়ায় তৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত। নারীর রাগ স্থান তিনটি—মস্তক, জঘন (কটিদেশ, নিতম্বের বিপরীত দিকের নিম্নভাগ, উদরের নিম্নভাগ) এবং হৃদয়। এই কয়টি স্থানে আঘাত করলে খণ্ডবেগা নারীও চণ্ডবেগা হয়ে ওঠে।

রতির শেষে দুই বিরুত-ধ্বনি 'শ্বসিত' ও 'কূজিত' প্রয়োগ করবে। ধাতুক্ষয়ের ফলে শ্রমের উৎপত্তি হওয়ায় ঐ দুটি স্বাভাবিক ধ্বনি।

বাঁশ ফুটে যে শব্দ করে তাকে দুৎকৃত বলে—এটি হল জিহ্বা দিয়ে 'টক্কর' দেওয়ার অনুকরণ। জলে কুল পড়লে যে শব্দ হয় তার অনুকরণ করার নাম 'ফুৎকৃত'।

নায়ক চুম্বনাদি করে ছেড়ে দিলে নায়িকা সীৎকারের সঙ্গে প্রতি-চুম্বন করে তার প্রত্যুত্তর দেবে। এই রূপ নায়কও করবে।

অষ্টম অধ্যায়

বিপরীত রতি : রতি রীতি

অবিরাম প্রহণন করতে করতে নায়কের শ্রান্ত হবার কথা। তখন নায়িকা পুরুষের মতো আচরণ করবে। নায়ক শ্রান্ত হয়েছে কিন্তু রাগের উপশম হয় নি, নায়িকা এই অবস্থা বুঝতে পেরে নায়কের অনুমতি নিয়েই নায়ককে নীচে ফেলে পুরুষের মতো সক্রিয় হবে।

এতে নায়ককে সাহায্য করা হবে।

অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই যে নায়ককে সাহায্য করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিপরীত রতির অনুষ্ঠান হবে তা নয়; কখনও নায়িকা নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্যই এ জাতীয় কামকেলিতে প্রবৃত্ত হতে পারে, আবার কখনও বা নায়কের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য পুরুষকে নিষ্ক্রিয় করে নিজে সক্রিয় হতে পারে।

এই পুরুষায়িত ব্যাপারের দুটি পথ।

প্রথম পথ—যোনিতে পুরুষলিঙ্গ যুক্ত থাকবে; সেই অবস্থাতেই নায়ক নায়িকাকে নিজের উপরে উঠিয়ে নেবে, নিজেকে ফেলে দেবে নীচে। এই পথ অবলম্বন করলে রতিরসের উপভোগে কোনো বাধা পড়বে না অর্থাৎ রতিক্রিয়ার রস অবিচ্ছিন্নই থাকবে।

দ্বিতীয় পথ—নায়ক যোনি থেকে লিঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে নীচে শয়ন করবে। নায়িকা উপরে উঠে নায়কের মতো আচরণ করতে শুরু

করবে। অর্থাৎ সমস্ত রতিক্রিয়াটিই আবার প্রথম থেকে শুরু হবে।

নায়িকা নায়কের উপরে উঠে কি করবে?

নায়ক যা-যা করেছিল ঠিক সেই সব করে যাবে। সে তার কেশের ফুল ছড়িয়ে দেবে—নায়কের দেহে, শ্বাস নেবার ফাঁকে ফাঁকে হেসে উঠবে, মুখে মুখ স্পর্শ করতে গিয়ে দুই স্তনের চাপে বক্ষঃপীড়া উৎপাদন করবে, বার বার মাথা নামিয়ে নামিয়ে যোনি-লিঙ্গের মিলন লীলার পুনরভিনয় করবে। নায়ককে দেখাবে—'দেখ, তোমার মতো আমিও পারি'। তার মনের ভাব তখন এই রকম হবে—'তুমি আমাকে এতক্ষণ নীচে ফেলে কষ্ট দিয়েছ, এখন আমিও তোমাকে নীচে ফেলে সেই ভাবেই কষ্ট দেব।' এই কথা বলে নায়িকা কখনও হাসবে, কখনও তর্জন গর্জন করবে, কখনও বা প্রতিশোধ নেবার জন্য আঘাত করবে।

অবশ্য, মাঝে মাঝে নারীসুলভ লজ্জার ভাবও দেখাবে; শ্রান্ত না হলেও শ্রান্তির ভাব দেখাবে। রমণে আগ্রহ থাকলেও 'আজ থাক', এই রকম অনাসক্তির ভাব দেখাবে।

তারপর পুরুষ যেমন রতিক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে সে তেমনি ভাবে সক্রিয় হবে।

পুরুষ সক্রিয়

যখন পুরুষ প্রযোক্তা তখন সেই অবস্থার নাম 'পুরুষোপসৃপ্ত' যখন নারী সক্রিয়—তখন নাম 'পুরুষায়িত'। 'পুরুষোপসৃপ্ত' কথাটি কামশাস্ত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। এর অর্থ -যে রতিক্রিয়ায় পুরুষ প্রধান বা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে।

পুরুষোপসৃপ্ত দুই শ্রেণীর—বাহ্য ও আভ্যন্তর। এদের মধ্যে বাহ্য শ্রেণীর বিবরণ প্রথমে দেওয়া হচ্ছে।

নায়িকা শায়িতা এবং নায়কের নানাবিধ বাক্যে তার চিত্ত বিক্ষিপ্ত। নায়ক প্রথমে তার নীবীবন্ধন খুলে দেবে। তাতে নায়িকা

নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করলে নায়ক তার কপোল চুম্বন করে তাকে আকুল করে তুলবে। তাতেও নায়িকার অনুরাগবহ্নি যদি উদ্দীপিত না হয় এবং তখন যদি নায়ক উপলব্ধি করে, তার সাধনযন্ত্র দৃঢ়তার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে, তবে তার কক্ষ, উরু ও স্তন হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে ধীরে ধীরে বুলিয়ে দেবে। হনুতে ও যমকে চুম্বনের জন্য নায়িকাকে দৃঢ় ভাবে গ্রহণ করবে।

তারপর হবে ক্রিয়ার জন্য যন্ত্রযোগ।

কিন্তু নায়িকার অনুরাগ জেগেছে কিনা, এই সব বাহ্য উপায়ের দ্বারা কি করে বোঝা যাবে ? এই জন্যই বাৎস্যায়ন আভ্যন্তর উপায়ের কথা বলেছেন—

রতিক্রিয়ার জন্য উদ্দিষ্টা নায়িকার অবস্থা তিন রকমের হতে পারে—প্রাপ্ত, প্রত্যাসন্ন এবং সন্ধুক্ষ্যমান।

১. প্রাপ্ত—যে রতিতে তৃপ্তি লাভ করেছে।

২. প্রত্যাসন্ন—অল্প ক্রিয়ার পরেই যে তৃপ্তি লাভ করবে।

৩. সন্ধুক্ষ্যমান—পুরুষ রতিতে তৃপ্তিলাভ করার পরেও যে নায়িকা তৃপ্ত হয় না, যন্ত্রযোগ ছাড়াতে চায় না এবং দংশন করতে থাকে।

আভ্যন্তর উপায় কি ?

পুরুষ যন্ত্রযোগের আগেই যোনি পরীক্ষা করবে। যোনিদেশ আলোড়িত করার পর যখন বুঝবে অভ্যন্তর অংশ কোমলভাব ধারণ করেছে এবং আলোড়নের ফলে নায়িকার রতিলাভও প্রায় আসন্ন—তখন যন্ত্র যোজনা করবে।

আভ্যন্তর প্রয়োগ দশপ্রকার—**উপসৃপ্তক, মন্থন, হুল, অবমর্দন পীড়িতক, নির্ঘাত, বরাহঘাত, বৃষাঘাত. চটকবিলসিত এবং সম্পুট।**

১. **উপসৃপ্তক**—যোনির সঙ্গে লিঙ্গের মিলন ঘটলেই তাকে উপসৃপ্তক বলা চলে। তার মধ্যে আবার যেটি সর্বজনবিদিত সরল মিলন তার নাম 'উপসৃপ্তক'।

২. **মন্থন**—লিঙ্গকে হাত দিয়ে ধরে চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মন্থন করলে তাকে বলা হবে 'মন্থন'।

৩. **হুল** স্ত্রীর জঘন নীচু করে, হুল ফুটিয়ে দেবার মতো যোনির ঊর্ধ্বভাগে যে 'ঘট্টন' করা হয় তার নাম 'হুল'।

৪. **অবমর্দন**—হুলের ক্ষেত্রে যে 'ঘট্টন' হয় তা বিপরীত হলে অর্থাৎ জঘনকে উঁচু করে তার উঁচু অংশে সবেগে 'ঘট্টন' করলে তাকে বলা হবে 'অবমর্দন।'

৫. **পীড়িতক**—লিঙ্গ আমূল প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে আঘাতে আঘাতে যোনিকে পীড়িত করা হলে—তাকে বলা হবে 'পীড়িতক'।

৬. **নির্ঘাত**—লিঙ্গ বহুদূর উত্তোলিত করে সবেগে যোনিতে আঘাত করলে তার নাম 'নির্ঘাত'।

৭ **বরাহঘাত**—যোনির একপাশে বহুবার দৃঢ়ভাবে আঘাত করলে তাকে বলা হবে 'বরাহঘাত'।

৮ **বৃষাঘাত**—ঐরূপ আঘাত (বরাহঘাত দ্রষ্টব্য) দৃঢ়ভাবে যোনির দুইপাশেই পর্যায়ক্রমে বার বার করার নাম 'বৃষাঘাত'।

৯. **চটকবিলসিত**—লিঙ্গ যোনির ভিতরে প্রবিষ্ট করে আবার তুলে নিয়ে (বের না করে) অর্থাৎ কিছু উপরে আকর্ষণ করে সেই স্থানেই দুই তিন কি চারবার 'ঘট্টন' করা হবে। যতক্ষণ রতির তৃপ্তি না হয় ততক্ষণ এই ভাবেই বার বার করার নাম 'চটকবিলসিত'।

১০. **সম্পুট**—ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'বিষম রতি' অংশে 'সম্পুটক' দ্রষ্টব্য। সেখানে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

নারী সক্রিয় (নারী পুরুষায়িত)

অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমাংশেই রতি ব্যাপারে পুরুষায়িত নারীর ভূমিকা সবিশেষ আলোচিত হয়েছে।

আগে বলা হয়েছে 'পুরুষোপসৃপ্তক' (অর্থাৎ যে রতিক্রিয়ায় পুরুষ

প্রযোক্তা) দুই শ্রেণীর—বাহ্য ও আভ্যন্তর। তেমনি 'পুরুষায়িত' ও (যে রতক্রিয়ায় নারী সক্রিয়) দুই শ্রেণীর—বাহ্য ও আভ্যন্তর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই দুই শ্রেণী ছাড়াও আরও তিন শ্রেণীর হয়— সন্দংশ, ভ্রমরক ও প্রেঙ্খোলিত।

১. **সন্দংশ**—যোনির ওষ্ঠপুটের দ্বারা লিঙ্গ চেপে ধরে নায়িকার চিরাবস্থানকে বলা হয় 'সন্দংশ।'

২. **ভ্রমরক**—লিঙ্গ যুক্ত হয়েও চক্রের ~~ন্যায়~~ ভ্রমণ করবে। এই ভ্রমণ অবশ্য অভ্যাস করে শিখতে হয়। একে বলে 'ভ্রমরক'।

৩. **প্রেঙ্খোলিত**—নারী যাতে ভ্রমরকের ব্যাপারে সহজে সিদ্ধিলাভ করতে পারে ; ভ্রমণ কালে যাতে লিঙ্গ যোনি থেকে বিশ্লিষ্ট না হয়ে যায় এই উদ্দেশ্যে পুরুষও সেই অবস্থাতেই নিজের জঘনদেশ দোলায়িত করবে। একে বলে 'প্রেঙ্খোলিত'।

পরিশ্রান্ত হলে নারী যুক্ত লিঙ্গ অবস্থাতেই পুরুষের কপালে কপাল রেখে বিশ্রাম করবে।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর পুরুষায়িত হওয়া নিষিদ্ধ—

ঋতুকালে ঋতুমতী নারী ঃ প্রদর প্রভৃতি রোগের আশঙ্কা থাকে।

অল্পকাল আগে সন্তান প্রসব করেছেন এমন নারী ঃ সহ্য করতে পারবে না।

গর্ভিণী নারী ঃ গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা থাকে।

অতিদীর্ঘা ও অতিস্থূলা নারী ঃ রতিক্রিয়ায় সমর্থ হবে না।

নবম অধ্যায়

রতির সূচনায় ঃ রতির অবসানে
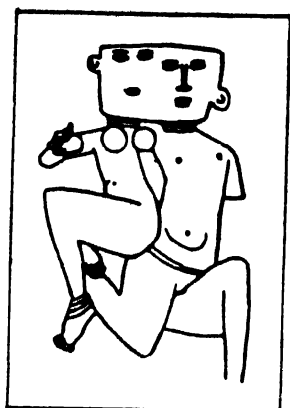
রতির সূচনায় কি করণীয় তা অবশ্য আগেই বলা উচিত ছিল। সঙ্গমবিধি আলোচিত হবার পর—রতির অবসানে কি কর্তব্য তার আলোচনার প্রয়োজন হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে আরম্ভের প্রসঙ্গটিও উঠছে।

রতিগৃহ পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত এবং সুরভি ধূপে সুবাসিত করতে হবে। যথাস্থানে শয্যা প্রস্তুত থাকবে এবং বসবার জন্য অন্য আসনেরও ব্যবস্থা হবে। স্নান করে পরিমিত অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে নয়িকা সেখানে আসবে। সঙ্গে পরিজন থাকবে পরিহাস ও প্রীতি কথা বিনিময়ের জন্য। নৃত্যযুক্ত সঙ্গীত এবং নৃত্যহীন সঙ্গীত—দুইই চলবে। তারপর নায়িকার অবস্থা বুঝে সখী ও অন্যান্য পরিজনেরা একে একে বিদায় নেবে। এর পর নায়কের পালা।

নায়িকার কাছে এসে নায়ক কি করবে তার নির্দেশ দিয়েই গ্রন্থ শুরু হয়েছে।

রতিক্রিয়ার অবসানে (রমণের পরে) দুজন সলজ্জ ভাবে পরস্পরকে না দেখেই পৃথক পৃথক স্থানে চলে যাবে শৌচকার্যের জন্য; যাবে সলজ্জভাবে—কিন্তু ফিরে এসে নির্লজ্জভাবেই উপযুক্ত স্থানে বসে পান খাবে, গায়ে চন্দন বা অন্য কোনো অনুলেপন

নিজেই মেখে নেবে ; বাম হাতে নায়িকাকে জড়িয়ে নিয়ে জলানুপান কিংবা সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি খেতে দেবে। সহ্য হয় এমন খাদ্য দুজনেই গ্রহণ করবে।

মাঝে মাঝে কোনো খাদ্যের একটু কামড়ে নিয়ে নায়িকাকে দিতে হবে—সঙ্গে থাকবে সামান্য একটু মন্তব্য—'খেয়ে দেখতে পারো, চমৎকার খেতে' ; অথবা 'এটি বেশ টক ও মিষ্টি, খাও একটু'।

যদি আকাশে চাঁদ থাকে তবে বাইরে বারান্দায় এসেও বসা যায় নায়িকাকে নিয়ে। নায়কের কোল ঘেঁষে বসবে নায়িকা—তখন কথাপ্রসঙ্গে নায়ক তাকে চাঁদের গল্প শোনাবে, শোনাবে নক্ষত্রের কথা—দেখিয়ে দেবে—'ঐ যে ধ্রুব, ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল!' রতির অবসানে স্বচ্ছ পরিবেশ ও সহজ সংলাপ অত্যন্ত প্রয়োজন ; এতে সমগ্র রতিক্রিয়া ব্যাপারটিই সুন্দর ও মধুময় হয়ে ওঠে। এতে অনুরাগেরও বৃদ্ধি ঘটে। রতিক্রিয়া যে কেবল দৈহিক নয়, এর সঙ্গে মনের সম্পর্ক রয়েছে এই সত্যটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সুতরাং রতির অবসানে—চকিত দৃষ্টি, সহজ কথার বিনিময়, গান—সবই চলতে থাকবে ; এতক্ষণ যদি দেহের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে—এখন হবে মনের ক্রিয়া। দাম্পত্য জীবনের শ্রীবর্ধনে এটি অপরিহার্য।

মাঝে মাঝে একটু কামশাস্ত্রের আলোচনাও প্রয়োজন। কামশাস্ত্রে দক্ষতা দাম্পত্যজীবনেরই সুখের জন্য এবং জীবনে শান্তিলাভের জন্য। এই বিদ্যা—আনন্দদায়িনী। আচার্যগণ শাস্ত্রে এই বিদ্যার বিভিন্ন নামকরণ করেছেন ঃ কেউ বলেছেন, 'নন্দিনী', কেউ বলেছেন, 'সুভগা', আবার কেউ বা বলেছেন—'নারীপ্রিয়া।'